Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সেক্যুলারিজম না শারীয়াহ কোনটা উত্তম কেন উত্তম

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আসমা সাদিয়া

রোলঃ 227021843

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সেক্যুলারিজম না শারীয়াহ কোনটা উত্তম কেন উত্তম

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আসমা সাদিয়া

রোলঃ 227021843

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " সেক্যুলারিজম না শারীয়াহ কোনটা উত্তম কেন উত্তম " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আসমা সাদিয়া, আইডিঃ 227021843 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আলী হাসান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " সেক্যুলারিজম না শারীয়াহ কোনটা উত্তম কেন উত্তম " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Asma Sadiya

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

আসমা সাদিয়া

আইডিঃ 227021843

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

In the Name of Allah, the Most Beneficent, the Most Merciful.

সকল প্রশংসা বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার জন্য, যিনি সপ্ত আসমান ও জমিনসমূহের ধারণকারী এবং সকল মাখলুকের ব্যবস্থাপক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক, তার কোনো শরীক নেই। তিনি সত্য ও সুস্পষ্ট মালিক। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ তার বান্দা, সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত রাসূল। আল্লাহ তার উপর, তার পরিবারবর্গ ও তার সকল সাথীর উপর সালাত ও সালাম নাযিল করুন।

ভূমিকা

সেক্যুলারিজম শব্দের সঠিক অনুবাদ হচ্ছে- ধর্মহীনতা। বাংলা ভাষায় শব্দটির অনুবাদ তা না করে করা হয়ে থাকে ধর্মনিরপেক্ষতা। বস্তুত এ মতবাদটি ধর্মকে এড়িয়ে নিছক বস্তুবাদী স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে মানববিদ্যা ও বুদ্ধির ভিত্তিতে মানবজীবন প্রতিষ্ঠার প্রতি আহ্বান করে। ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি বলতে বুঝানো হয় ধর্মের প্রভাবমুক্ত রাষ্ট্রব্যবস্থা।

আরব বিশ্বে এই মতবাদকে বুঝাতে 'লা-দ্বীনিয়্যাহ্ (لا دينية) বা 'ধর্মহীনতা' বলার কথা থাকলেও এ মতবাদের প্রবর্তকরা সে শব্দটির পরিবর্তে 'ইলমানিয়্যাহ' (علمانية)বা 'বিজ্ঞানময়' শব্দটি ব্যবহার করে থাকে। প্রথম দৃষ্টিতে কারও কারও মতে হতে পারে যে শব্দটি বোধ হয় 'ইলম' তথা 'জ্ঞান' থেকে গ্রহণ করা হয়েছে । বস্তুত বিষয়টি এ রকম নয়। এ মতবাদের সাথে বিজ্ঞান বা Science এর কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু তারা এ শব্দটি ব্যবহারে বেশি সাচ্ছন্দ বোধ করে; কারণ শব্দটিকে জ্ঞানের দিকে সম্পর্কযুক্ত করতে পারলে আরব সমাজে অপেক্ষাকৃত কম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে। তাই এ বিভ্রান্তির নিরসনার্থে শব্দটিকে আরবীতে 'ইলমানিয়্যাহ্' উচ্চারণ না করে 'আলামানিয়্যাহ' বলা উচিত।

আমরা আগেই বলেছি যে, এ মতবাদের উৎপত্তিস্থলে তার জন্য Secularism শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যার অর্থ হচ্ছে ধর্মহীনতা বা ধর্মের সাথে সম্পর্কহীন। কিন্তু বাংলাভাষাভাষি মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য এর একটি ভুল অনুবাদ করা হয়ে থাকে, আর বলা হয় যে, এর অর্থ, ধর্মনিরপেক্ষতা।

আমরা এ প্রবন্ধে এটাকে এ প্রচলিত অর্থেই বর্ণনা করব। পাঠকগণ অবশ্যই সেটাকে তার আসল অর্থে বুঝে নিবেন।

Secularism যাকে ধর্মনিরপেক্ষতা বলা হয়ে থাকে, তার সর্বজনস্বীকৃত সংজ্ঞা হচ্ছে- রাষ্ট্রীয় ও সমাজিক জীবন থেকে ধর্মকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা। ধর্ম ব্যক্তির অন্তরের খাঁচায় বন্দি থাকবে। ধর্মের পরিধি ব্যক্তি ও তার উপাস্যের সম্পর্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

ইসলামী শরীয়াহ শব্দটি আরবি ভাষার "শারআ" মূল শব্দ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ হলো "পথ" বা "প্রণীত বিধান"। শরীয়াহ ইসলামের আল্লাহপ্রদত্ত সেই বিধি ও নীতি যা মানব জীবনের সকল দিক পরিচালনা করে। এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা যা ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, এবং রাষ্ট্রের কার্যক্রমকে পরিচালিত করে।

ইমাম ইবনে আল-কায়্যিম (রহ.) বলেছেন:

"শরীয়াহ হলো ন্যায়বিচার, দয়া, কল্যাণ এবং প্রজ্ঞার ওপর প্রতিষ্ঠিত। ইসলামের যে কোনো বিধান যদি এর বিপরীত হয়, তবে তা শরীয়াহর অন্তর্ভুক্ত নয়।"

★সেক্যুলারিজম ব্যবস্থায় সিদ্ধান্ত নেয়ার মাপকাঠি হলো তাদের খেয়ালখুশি ও কামনা বাসনা, যেগুলোকে তারা নিজেদের ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করেছে।

ইসলামী শরীয়াহর সৌন্দর্য হলো শরীয়াহ মানুষের ফিতরাহ বা সহজাত প্রবণতার (Natural Disposition) সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর খেয়ালখুশিকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করা সেক্যুলার ব্যবস্থা ফিতরাহর সাথে সাংঘর্ষিক। মানুষ ফেরেশতা না। প্রাণী হিসেবে মানুষ একই সাথে ধারণ করে অত্যন্ত মহৎ এবং অত্যন্ত পাশবিক আচরণের সক্ষমতা ও প্রবণতা। মানুষের পক্ষে সম্ভব না নিষ্পাপ হওয়া। সম্ভব না নিজের কুপ্রবৃত্তি, কুচিন্তাকে সম্পূর্ণভাবে ঝেড়ে ফেলা। মানুষের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রয়োজন ব্যক্তির ভেতর উপযুক্ত মানসিক অবস্থা এবং তার চারপাশে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টিশীল করা। অর্থাৎ প্রথমে ব্যক্তির মধ্যে এমন উপলব্ধি তৈরি করা যার কারণে ব্যক্তি নিজের ভেতর অনুভব করবে নিষিদ্ধ কাজগুলো থেকে দূরে থাকার, সেগুলোকে ঘৃণা ও বর্জন করার আকাঙ্ক্ষা। পাশাপাশি এমন একটি সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিবেশ সৃষ্টি করা হবে যেখানে চাইলেও সীমালঙ্ঘন করা মানুষের জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। হাতের নাগালে যিনা, অশ্লীলতা, নেশা, জালিয়াতি, বাটপারির সুযোগ রেখে তারপর মানুষ নিজে নিজে ভালো থাকবে, এই আশা করে লাভ নেই।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ ঘোষণা করে দিয়েছেন যে,

'আল্লাহর নিকট একমাত্র গ্রহণযোগ্য দীন ধর্ম বা জীবনবিধান হচ্ছে ইসলাম।' (সূরা আলে ইমরান : ১৯)।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ

أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾]النساء :٦٠ [الشَّيْطَانُ

"তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা দাবী করে যে, নিশ্চয় তারা ঈমান এনেছে তার উপর, যা নাযিল করা হয়েছে তোমার প্রতি এবং যা নাযিল করা হয়েছে তোমার পূর্বে। তারা তাগূতের কাছে বিচার নিয়ে যেতে চায় অথচ তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাকে অস্বীকার করতে। আর শয়তান চায় তাদেরকে ঘোর বিভ্রান্তিতে বিভ্রান্ত করতে"। [সূরা আন-নিসা: ৬০]

তাগূত বলতে এখানে শারীয়াহ অমান্যকারীদের বুঝানো হয়েছে।

সেক্যুলারিজম

সেক্যুলারিজমের সংজ্ঞা

সেক্যুলারিজম শব্দটির সংজ্ঞা হচ্ছে, 'নট রিলেটেড উইথ এনি রিলিজিয়াস অ্যান্ড স্পিরিচুয়াল ম্যাটার।' মানে 'যার ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক বিষয়ের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই'। এমন ব্যক্তি, সমাজ, নীতি ও সংস্থাকে বলে সেক্যুলার।

সেক্যুলারিজম-এর সঠিক বাংলা অনুবাদ হবে ধর্মহীনতা। যারা এর অনুবাদ করেন ধর্মনিরপেক্ষতা, তাদের এ অনুবাদে ভিন্ন কিছু বোঝানোর সুযোগ রয়েছে। যেমন, বাংলাদেশের সংবিধানের মূল অংশে রাষ্ট্রীয় মূলনীতিতে এটি ধর্মহীনতা অর্থে ব্যবহৃত হয়নি বরং সব নাগরিকের সমান ধর্মীয় অধিকার অর্থে ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দে উল্লেখিত হয়েছে। আমাদের সংবিধানের ব্যাখায় বঙ্গবন্ধু বলেছেন, ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়, এর অর্থ সব নাগরিকের নিজ নিজ ধর্ম পালনের অধিকার। অতএব মূল অর্থে সেক্যুলারিজমকে নির্দ্বিধায় ইসলাম বহির্ভূত একটি মতবাদ বলা যায়, ধর্মহীনতা বলা যায়, আর আসলেই যে অর্থে এর উদ্ধাতা এটি তৈরি করেছেন। মৌলিক বইপত্র, এনসাইক্লোপেডিয়া ও ডিকশনারিতে এর দার্শনিক ও প্রচারকরা যে সংজ্ঞা তুলে ধরেছেন। এটি সঠিক অর্থে কোনো ধর্মে বিশ্বাসী মানুষই অনুসরণ করতে পারে না। ধর্মহীন মানুষই কেবল বাস্তব অর্থে সেক্যুলার হতে পারে।

কিছু জিনিস আছে যেগুলোর ব্যাখ্যা দেওয়া লাগে না। এমনিই বুঝে আসে। 'ধর্মনিরপেক্ষতা' শব্দটিও এমন। কম পড়ুয়া লোকজনও এর অর্থ বুঝে নিতে পারবে। ইংরেজি Secularism শব্দের বাংলারূপ হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষতা, আরবীতে যাকে বলা হয় 'আলমানিয়্যাহ'।

প্রথমেই দেখুন বাংলা একাডেমীর ইংলিশ-বাংলা ডিকশনারী। Secular-(অর্থ) পার্থিব, ইহজাগতিকতা, জড়, জাগতিক।

Secular State 'গীর্জার সঙ্গে বৈপরিত্যক্রমে রাষ্ট্র'। এ অর্থ অনুযায়ী মুসলিম দেশে এর ব্যাখ্যা হবে মসজিদের সঙ্গে বৈপরিত্যক্রমে রাষ্ট্র।

Secularism নৈতিকতা ও শিক্ষা ধর্মকেন্দ্রিক হওয়া উচিৎ নয়-এই মতবাদ। জাগতিকতা, ইহবাদ।

এ অর্থগুলো লিখেছে বাংলা একাডেমীর অভিধান। এটির সম্পাদনায় কোনো ডানপন্থী বা কোনো 'হুজুর' জড়িত ছিলেন না। জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী সাহেব ছিলেন এর সম্পাদক।

এটা এমন নয় যে, কোনো মতবাদ ওয়ালারা নিজ মতবাদকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য এ ব্যাখ্যা লিখেছে; বরং দেশের সরকার-নিয়ন্ত্রিত এবং বর্তমান সরকার নিয়ন্ত্রিত সরকারী প্রতিষ্ঠান বাংলা একাডেমী, যারা সংবিধানে আবার সেকুলারিজমকে স্থান দিয়েছে তাদের কর্তৃক নিয়োজিত, নির্ভরযোগ্য, যোগ্য ব্যক্তিরাই সেকুলারিজমের এই অর্থ ও ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

দেখে ভালো লেগেছে যে, ওনারাও ভালো মানুষ। রাখঢাক না করে সাফ সাফ কথাটাই মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন। 'ধর্মনিরপেক্ষতা ধর্মহীনতা নয়'-এমন কথা লেখেননি। আমি বাইরের অভিধানেও খোঁজ করেছি। ইনসাইক্লোপিডিয়া অব ব্রিটেনিকা দেখেছি, উইকিপিডিয়া দেখেছি। একই ব্যাখ্যা পেয়েছি। অক্সফোর্ড ইংরেজী-উর্দু ডিকশনারী । সেখানে লেখা আছে, Secularism (لا دينية لا مذهبية ،)ধর্মহীনতা।

এগুলো মুসলমানদের ব্যাখ্যা নয়। সেকুলারিজম যে বাস্তবেই لا دينية لا مذهبية ، (ধর্মহীনতা) এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায় না। বাংলা একাডেমীরটা তো দেখলেনই। উইকিপিডিয়াতে সেকুলারিজমের ব্যাখ্যা করা হয়েছে Anti Islam দিয়ে।

★আল্লাহ বলেছেন, 'আর যে ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো জীবনব্যবস্থা তালাশ বা অবলম্বন করবে, তার কাছ থেকে সেটি কোনোদিনই গ্রহণ করা হবে না। আর সে ব্যক্তি পরকালে হবে ব্যর্থ ও মহা ক্ষতিগ্রস্ত'। (সূরা আলে ইমরান : ৮৫)।

ইসলামের এ স্পষ্ট ঘোষণা থেকে দিবালোকের মতো উজ্জ্বল হয়ে যায় যে, ইসলামে থাকাবস্থায় মুসলিমদের পক্ষে আংশিক বা পূর্ণ ইসলাম ত্যাগ করার কোনো সুযোগ নেই। ধর্মকে একান্ত ব্যক্তিগত বিষয় বানিয়ে রাখার অধিকারও নেই। ইসলামের পাশাপাশি অপর কোনো ধর্ম বা জীবনব্যবস্থা গ্রহণ করারও উপায় নেই। জীবনের কোনো ক্ষেত্রে কোনো পর্যায়ে ধর্মহীন হওয়ার অবকাশও নাই। মুসলমানদের কেবল মুসলমান হতে হবে, সেক্যুলার মুসলমান হওয়ার কোনো ব্যবস্থা নেই।

সেক্যুলারিজমের স্তর

প্রথম স্তর: যে সেক্যুলারিজম ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও অধিকার বিনষ্ট করে দেয়।

এখানে ধর্মের কোনো প্রকার স্বাধীনতা ও অধিকার নেই। মুসলিমরা তাদের ধর্ম পালন করতে পারে না। এর উদাহরণ এমন রাজনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে মুসলিমরা সালাত পড়তে পারে না। সিয়াম রাখতে গেলে কঠোরতা আরোপ করা হয়। দীনের অনুসরণের কারণে তাদেরকে হত্যা, শাস্তি ও হিজরতে বাধ্য করা হয়। এগুলো নিঃসন্দেহে কট্টর ও ধর্ম-বিরোধী রাজনৈতিক ব্যবস্থা।

কিন্তু এ প্রকার যুলুমের সাথে সেকুলারিজমের মৌলিক কোনো সম্পর্ক নেই। এটি এক প্রকার জবরদস্তিমূলক স্বৈরাচারী সরকার-ব্যবস্থা যেটা সেকুলারিজমকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছে। বস্তুত সেকুলারিজম বলতে বোঝায় ধর্মের ব্যাপারে নির্দিষ্ট অবস্থান। ধর্মের অনুসারীদের উপর শারীরিক নির্যাতন করা ভিন্ন বিষয়। সুতরাং সেকুলারিজমের সাথে দ্বন্দ্বের সাথে এই দিকটার কোনো সম্পর্ক নেই।

দ্বিতীয় স্তর: ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে আলাদা করা। সাধারণ জীবনযাত্রায় ধর্মের উপস্থিতি নিয়ে মতপার্থক্য। এটি মূলত সেকুলার চিন্তার ভেতর প্রকৃত মতভেদের স্তর। কারণ সেকুলারিজম চিন্তার স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেয়। ধর্ম থেকে রাষ্ট্র পৃথক করাই এর ভিত্তি।

সেক্যুলারিজমের দুটি ভাগ

[1] আমরা সেকুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতাকে সরাসরি নাস্তিকতা ও পরোক্ষ নাস্তিকতা দু'ভাগে ভাগ করেছি, কারণ সাধারণ লোকেরা নাস্তিকতা বলতে আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করাকেই বুঝায়, অথচ সেকুলারিজম বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাও এক প্রকার নাস্তিকতা, বরং নাস্তিকতার একটি শাখা হচ্ছে সেকুলারিজম বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতা।

[2] দ্বীনের সাথে পরোক্ষ নাস্তিকতা বা সেকুলারিজমের (ধর্মনিরপেক্ষতার) সংঘর্ষ অনেকের নিকট স্পষ্ট নয়, কারণ তাদের নিকট দ্বীন হচ্ছে ধর্মীয় কয়েকটি ইবাদতের নাম। তাই এ পরোক্ষ সেকুলারিজম (পরোক্ষ ধর্মনিরপেক্ষতা) যেহেতু মসজিদে সালাত আদায় ও বায়তুল্লাহ শরীফের হজকে নিষেধ করে না, তারা ধারণা করে নিয়েছে যে, ধর্মনিরপেক্ষতা দীন বিরোধী নয়। কিন্তু দীনকে যারা সঠিকভাবে বুঝেন, তারা অবশ্যই জানেন যে, সেকুলারিজম (তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতা) দীনের সাথে সাংঘর্ষিক। যে মতবাদ মানুষের জীবনের সব শাখায় আল্লাহর শরীয়তকে নিষিদ্ধ ও হারাম ঘোষণা করেছে, তার চেয়ে স্পষ্ট ও কঠিন ইসলাম বিরোধী কোনো মতবাদ কি আছে? যদি তারা তা বুঝে!

[3] কারণ তারা ভালো করেই জানে যে এরা এগুলো ব্যবহার করার মাধ্যমে মানুষকে ধোকা দিচ্ছে।

[রেফারেন্স : দেখুন: শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব রহ. রচিত نواقض الإسلام গ্রন্থের ইসলাম বিনষ্টকারী চতুর্থ প্রকার। আরো দেখুন: শায়খ আব্দুল আযীয ইবন বায রহ. রচিত العقيدة الصحيحة গ্রন্থের (৭) নং পৃষ্ঠা]

দেখুন: শায়খ আব্দুল আযীয ইবন বায রহ. রচিত العقيدة الصحيحة গ্রন্থের (২৭) নং পৃষ্ঠা]

সেক্যুলারিজমের উদ্ভব

এ মতবাদটি ১৭শত শতাব্দীতে ইউরোপে আত্মপ্রকাশ করে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে এটি প্রাচ্যে প্রসারিত হয়। প্রথমদিকে মিসর, তুরস্ক, ইরান, লেবানন, সিরিয়াতে প্রসার লাভ করে। ধীতীন তিউনিশিয়াতে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে ইরাকে প্রসার লাভ করে। এছাড়া বিংশ শতাব্দীতে এসে অন্যান্য আরব দেশগুলোতেও বিস্তার লাভ করে।

সেক্যুলারিজমের উদ্দেশ্য

সেক্যুলারিজম একটি ধর্মহীন মতবাদ। এর প্রণয়ন ও প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ধর্মহীন সমাজব্যবস্থা কায়েম করা। ধর্মীয় জীবনব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করা। এই নাস্তিক্যবাদী মতাদর্শের মোকাবিলা করতে ধর্মগুলোকে বহু কম্প্রোমাইজ করতে হয়েছে। তবে একমাত্র ইসলাম এই মতাদর্শের সাথে কম্প্রোমাইজ না করে নিজের স্বকীয়তা নিয়ে টিকে রয়েছে। এই ধর্মহীন মতাদর্শকে চ্যালেঞ্জ করেই দীন হিসাবে পৃথিবীতে এগিয়ে চলেছে। কারণ, ইসলাম অন্যান্য ধর্মের মতো নিছক ধর্মমাত্র নয়। কিছু আনুষ্ঠানিকতার নাম ইসলাম নয়।

সেক্যুলারদের চিন্তাধারা ও বিশ্বাসাবলী:

• কিছু ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তি আল্লাহর অস্তিত্বকেও অস্বীকার করে। তাদের কেউ কেউ আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস রাখলেও আল্লাহর অস্তিত্বের সাথে মানুষের জীবনের কোনরূপ সম্পর্ক আছে বলে তাঁরা বিশ্বাস করে না।

• নিছক বিজ্ঞানের ভিত্তিতে এবং বিবেক ও অভিজ্ঞতার শাসনাধীনে মানবজীবন প্রতিষ্ঠিত হবে।

• আধ্যাত্মিক জগৎ ও বস্তুজগতের মধ্যে দুর্ভেদ্য ব্যবধান তৈরী করা। তাদের দৃষ্টিতে আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ নেতিবাচক মূল্যবোধ।

• ধর্মকে রাজনীতি থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন রাখা এবং নিরেট বস্তুবাদী ভিত্তির উপর জীবন প্রতিষ্ঠিত করা।

• জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে pragmatism (সুবিধাবাদ) প্রতিষ্ঠা করা।

• শাসন, রাজনীতি ও নীতি নৈতিকতার ক্ষেত্রে ম্যাকিয়াভেলীরসূত্র অনুসরণ করা।

• অশ্লীলতা ও চারিত্রিক অবক্ষয় ছড়িয়ে দেয়া এবং পারিবারিক ভিত ভেঙ্গে দেয়া। যেহেতু পরিবার হচ্ছে সামাজিক বন্ধনের প্রথম বীজ।

• শাসন, রাজনীতি ও নীতি নৈতিকতার ক্ষেত্রে ম্যাকিয়াভেলীর সূত্র অনুসরণ করা।

• অশ্লীলতা ও চারিত্রিক অবক্ষয় ছড়িয়ে দেয়া এবং পারিবারিক ভিত ভেঙ্গে দেয়া। যেহেতু পরিবার হচ্ছে সামাজিক বন্ধনের প্রথম বীজ।

• সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও মিশনারী সংস্থাগুলোর অপচেষ্টায় আরব ও মুসলিম বিশ্বে প্রচারিত ধর্মনিরপেক্ষ বিশ্বাসগুলো হচ্ছে-

- ইসলাম, কুরআন ও নবুয়তের মূলে আঘাত করা।

-এ দাবী করা যে, ইসলামের আবেদন নিঃশেষ হয়ে গেছে। ইসলাম কিছু আধ্যাত্মিক পূজা-অর্চনা ছাড়া কিছু নয়।

-এ দাবী করা যে, ইসলামী ফিকহ বা ইসলামী আইন শাস্ত্র রোমান আইন থেকে উদ্ভুত।

-এই দাবী তোলা যে, ইসলাম বর্তমান সভ্যতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ইসলাম মানুষকে পশ্চাৎমুখী হওয়ার আহবান জানায়।

-পাশ্চাত্য চিন্তাধারার আলোকে নারীমুক্তির আহবান জানানো।

-ইসলামী সভ্যতাকে বিকৃতভাবে পেশ করা।

-ইসলামের ইতিহাসে সংঘটিত ধ্বংসাত্মক আন্দোলনগুলোকে অতিরঞ্জিতভাবে প্রচার করা এবং এ আন্দোলনগুলোকে সংস্কারমূলক আন্দোলন হিসেবে দাবী করা।
-প্রাচীন সভ্যতাগুলোকে পুনর্জীবিত করার চেষ্টা করা।

-পাশ্চাত্যের ধর্মহীন আইনকানুন ও কারিকুলাম আমদানী করা এবং নিজেদের কর্মকাণ্ডে পাশ্চাত্যের ধারা চালু করা।

- নতুন প্রজন্মকে ধর্মহীন প্রজন্ম হিসেবে গড়ে তো।

ইসলামী শারীয়াহ নিয়ে সংশয়:

★প্রথম সংশয়:

তারা বলেন, ইসলামী শরীয়াহর বাস্তবায়ন অমুসলিম সংখ্যালঘুদের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়বে, মানুষের অন্তরে সাম্প্রদায়িক হিংসা বিদ্বেষ বৃদ্ধি পাবে, যা জাতিকে নানা দলে বিচ্ছিন্ন করবে। জাতির জন্য কল্যাণকর ও এ ব্যাধি থেকে বাঁচার উপায় হলো মানব রচিত সংবিধান অনুযায়ী সমাজ পরিচালনা করা, যেখানে আক্বিদা বা দ্বীনের কোনো সম্পর্ক নেই। যেখানে মানুষ নানা মত পোষণ করবে।।

তারা ইসলামী শরী'য়াহর ব্যাপারে অপবাদ দেয় যে, এটা অমুসলিম সংখ্যালঘুদের অধিকার নিশ্চিত করে না। তাদের অধিকার ক্ষুণ্ণ করে, তাদেরকে মানুষ হিসেবে সম্মানজনক ভাবে বেঁচে থাকার মানবাধিকার চর্চা করতে দেয় না। কিন্তু তারা একথা নিশ্চিতভাবেই জানে যে, এটা শুধুই মিথ্যা অপবাদ। ইতিহাস তাদের এ অপবাদ মিথ্যা সাব্যস্ত করে, যখন থেকে মুসলমানরা বিভিন্ন রাষ্ট্র বিজয় করেছে তাতে সংখ্যালঘু ছিল। বরং তাদের মধ্যে যারা ন্যায়নীতিবান, গোঁড়ামির কারণে ইসলামকে অপবাদ দেয় না তারাও এ সব অপবাদ মিথ্যা প্রতিপন্ন করেন। আল-কুরআনের বিভিন্ন আয়াত তাদের এ অপবাদ মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ] (البقرة :٢٥٦[

"দ্বীন গ্রহণের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই। নিশ্চয় হিদায়াত স্পষ্ট হয়েছে ভ্রষ্টতা থেকে"। [সূরা আল-বাক্বারাহ: ২৫৬] যেখানে অন্যান্য ধর্মের প্রধানরা তাদের অনুসারীদেরকে মানুষকে তাদের ধর্মে দীক্ষিত করতে জোরালো নির্দেশ দেয়, সেখানে আমরা দেখি ইসলাম কাউকে এ ধর্মে দীক্ষিত হতে জবরদস্তি করে না। বরং ইসলাম তার ছায়াতলে অন্যান্য মানুষকে তাদের আক্বিদা নিয়ে স্বাধীনভাবে থাকতে আহ্বান করে।

[' শুবহাত হাওলাল ইসলাম, লেখক মুহাম্মদ কুতুব, পৃষ্ঠা ১৭৬]

তাদের সাথে কোনো চুক্তি করলে তা পূরণ করা। তাদের সঙ্গে কৃত অঙ্গিকার ও চুক্তি পূরণে কার্পণ্য না করা। আবু দাউদ রহ. তাঁর সনদে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

قد روى أبو داود بسنده عن رسول الله ﷺ أنه قال :»أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهَدًا أَوِ انْتَقَصَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ، أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ، فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

' পূর্বসূত্র, পৃষ্ঠা: ২৩৪।

* আল-খিরাজ, লেখক আবু ইউসুফ, পৃষ্ঠা: ১৩৮। 62

"যে ব্যক্তি কোন (অমুসলিম) চুক্তিবদ্ধ কারো উপর যুলুম করবে বা চুক্তি ভঙ্গ করবে, বা তাঁর সাধ্যের বাইরে কিছু চাপিয়ে দিবে, বা তার সন্তুষ্টি ছাড়া বেশী নিবে কিয়ামতের দিন আমি তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবো"।

ইবন মাজাহ তে বর্ণিত আছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :»مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ فَلَا يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ عاما

"আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জিম্মায় থাকা কোন (অমুসলিম) চুক্তিবদ্ধ কাউকে হত্যা করবে সে

জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। জান্নাতের ঘ্রাণ সত্তর বছরের রাস্তার দূরত্ব থেকে পাওয়া যায়"।"
কাফির আত্মীয়ের সাথে মুসলমানের সম্পর্ক ছিন্ন করা ও তাদেরকে ভালবাসতে নিষেধ করা হয়েছে, তথাপি আল-কুরআন তাদের সাথে সদ্ভাবে বসবাস করতে নির্দেশ দিয়েছে, যদিও তারা মুসলমানদের ধর্ম অস্বীকার করে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَإِن جَـٰهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعُكُمْ

﴿ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [لقمان :١٥]

"আর যদি তারা তোমাকে আমার সাথে শিরক করতে জোর চেষ্টা করে, যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তখন তাদের আনুগত্য করবে না এবং দুনিয়ায় তাদের সাথে বসবাস করবে সদ্ভাবে। আর অনুসরণ কর তার পথ, যে আমার অভিম তারপর আমার কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন। তখ 60/79 তোমাদেরকে জানিয়ে দেব, যা তোমরা করতে"। [সূরা লুকমান:১৬]

এটা হলো ব্যক্তি পর্যায়ে, আর সমষ্টিগতভাবে ইসলাম তাদের সাথে সদ্ব্যবহার ও তাদের প্রতি ইহসান করতে নিষেধ করে নি। তবে শর্ত হলো তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না।

★দ্বিতীয় সংশয়: ইসলামের শাস্তির বিধান সম্পর্কিত সংশয়।

তারা বলেন, ইসলামে শাস্তির বিধান খুবই নিষ্ঠুর, যা যুগের সাথে চলে না। নাগরিক জীবনে এগুলো চলে না। অতঃপর তারা বলেন, বিবাহিতের যিনার শাস্তি রজম তথা পাথর দ্বারা মৃত্যুদণ্ড কেন? এটা কি তাকে অপমান করা নয়? এ ধরনের শাস্তি মানুষের প্রাণনাশ বা অঙ্গ কর্তন হয়, এভাবে মানুষ শক্তি হারায় এবং শারীরিক বিকৃতি ঘটে। অতঃপর তারা বলেন, ইসলামের শাস্তির বিধান বাস্তবায়ন মানে হলো পূর্বযুগে ফিরে যাওয়া, মক্কার পাহাড়ের মাঝে তৈরি এ সব আইন কানুন বিংশ শতাব্দীতে জ্ঞানবান মানুষের সাথে চলে না।

[' পূর্বসূত্র, পৃষ্ঠা নং ২৪৮-২৫১]

এ সব সংশয়সমূহ অপনোদনের পূর্বে তাদের এ ধরনের সংশয়ের কারণসমূহ আলোচনা করব। প্রথম কারণ: ইসলামী শরীয়াহর শাস্তির বিধান সম্পর্কে অজ্ঞতা। দ্বিতীয় কারণ: যে সব অপরাধের কারণে শাস্তি দেয়া হয় সেগুলোর ভয়াবহতা বিশ্লেষণে অগভীরভাবে দৃষ্টিপাত করে। ফলে তারা এর হিকমত ও মূল্যায়ন সম্পর্কে ভাবে না। তৃতীয় কারণ: তারা অপরাধ ও শাস্তির বিধানকে ইসলামের দৃষ্টিতে গবেষণা করে না। হ্যাঁ ইসলামের শাস্তির বিধানে বাহ্যিক ভাবে কিছুটা নিষ্ঠুরতা ও কঠোরতা দেখা যায়। শাস্তিতে যদি কঠোরতা ও নিষ্ঠুরতা নাই থাকে তাহলে তিরস্কার ও ভয় দেখানোর ফল কিভাবে আসবে। শাস্তি বাহ্যিক ভাবে কঠোর ও নিষ্ঠুর হলেও প্রকৃতপক্ষে তা রহমত ও দয়া। কেননা রোগাক্রান্তকে যদি ছেড়ে দেয়া হয় তবে তার রোগে সমাজের অন্যান্য ভালোরাও রোগী হয়ে যাবে। বরং অপরাধের ক্যান্সারে অন্যরাও আক্রান্ত হয়ে যাবে। তাই এটা অত্যাবশ্যকীয় ও হিকমতময় যে, সমাজের অন্যান্যদেরকে বাঁচাতে নষ্ট জিনিসকে চিরতরে নিঃশেষ করে দেয়া।।

উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু ছিলেন ইসলামের ফকিহদের মধ্যে অন্যতম, তিনি (রামাদাহর বছর) দুর্ভিক্ষের বছর চুরির শাস্তি প্রয়োগ করেন নি। এটা স্পষ্ট মূলভিত্তি, এখানে তা'বীল করার কোনো সুযোগ নেই। সমস্যা ও সন্দেহের কারণে শাস্তর বিধান রহিত হয়ে যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্নোক্ত হাদীসে কারণে,

«ادرؤوا الحدود بالشبهات وأقيلوا عثرات الكرا إلا في حد من حدود الله». "তোমরা সংশয়ের কারণে শাস্তির বিধান রহিত করো, আল্লাহর শাস্তি ব্যতিত সম্মানিত লোকের ছোট খাট ভুল থেকে অব্যাহতি দাও"।

[শোবহাত হাওলাল ইসলাম, পৃষ্ঠা: ১৩৭]

তাদের দাবী হল, আল্লাহর শাস্তির বিধান প্রয়োগ করলে মানুষকে অবজ্ঞা ও হেয় প্রতিপন্ন করা হয়। আর যে সব দেশ গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদী স্বাধীনতা ভোগ করে সে সব দেশের আধুনিক মতবাদের বিশ্বাসী ও রাজনীতিবিদরা মনে করেন মানুষকে শাস্তি দিয়ে নখ তুলে ফেলা, শরীর ঝলসানো, মাথায় ও শিরায় ইলেকটিক্যাল শক দেয়া, আগুনের দ্বারা সেক দেয়া, চুল উপড়ে ফেলা, তার সম্মানহানি করা ইত্যাদি মানুষকে অবজ্ঞা ও হেয় প্রতিপন্ন করা নয়! তারা আবার তাদের আইন কানুন ও সমাজ ব্যবস্থা নিয়ে গর্ব করে?!

বিবাহিত মানুষকে রজমের মাধ্যমে হত্যা করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এ মারাত্মক অপরাধের কঠোর ধমক ও তিরস্কার করা। রজমকৃতকে এভাবে হত্যা করার উদ্দেশ্য হলো তাকে কঠোর শাস্তি দেয়া আর অন্যান্যদেরকে এ ধরনের অপরাধ থেকে বিরত রাখা ও নিজের আত্মা ও শয়তান যাদেরকে এ ধরনের কাজে প্রলুব্ধ করে তাদের বিরত রাখা।

শরীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সেক্যুলারিজম

ধর্মনিরপেক্ষতাটা বেশি দিন আগের পরিভাষা নয়। অনেক আগ থেকে তা শুরু হয়েছে এমন নয়। ফরাসী বিপ্লবের পরের ঘটনা এগুলো। বিপ্লবটা ১৭৮০/১৭৯০এর দিকের অর্থাৎ ১৮০০ এর কাছাকাছি সময়ের। ইসলামী খেলাফতের পতনের পরের ঘটনা।

ইসলামী খেলাফত শেষ হওয়ার পর মুসলমানরা এসবের সম্মুখীন হয়েছে। আর পশ্চিমাবিশ্ব যখন তাদের পার্থিব উন্নতি ও মনোরঞ্জনের পথে কিছু কিছু জায়গায় চার্চগুলোতে তাদের ধর্মীয় নেতাদেরকে তাদের বিরোধী মনে করেছে তখন থেকে এ ধরনের চিন্তা কারো কারো মাথায় চাড়া দিয়ে উঠেছে এবং ধীরে ধীরে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতির প্রসার ঘটেছে।

সেকুলারিজম মুসলমানদের মধ্যে

মুসলিম রাষ্ট্রের মধ্যে মুস্তফা কামাল পাশা আতাতুর্ক (জন্ম: ১৮৮১, মৃত্যু: ১৯৩৮)। ১৯ শতকের শুরুতে ধর্মনিরপেক্ষতাকে একেবারে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে।

মুসলমানদের সর্বশেষ দারুল খিলাফা তুরস্কে বসে ঐ লোকটি এ কাজ করেছিল। তার ক্ষমতার মেয়াদকাল ছিল ১৯২৩-১৯৩৮ পর্যন্ত। তখনকার সময়ে সেকুলারিজমটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। ঐ ব্যক্তি ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিকে পুঁজি করে কত কি সংঘটিত করেছে তা ভাবলেও গা শিউরে উঠে।

ইসলামী শারীয়াহ

ইসলামী শারীয়াহ হল একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা যা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী মানুষের জীবনের সব দিক পরিচালিত করার জন্য নির্দেশনা দেয়। এটি শুধু ধর্মীয় ইবাদত বা উপাসনার সীমাবদ্ধ নয়, বরং ব্যক্তি, সমাজ এবং রাষ্ট্রের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। শরীয়াহর মূল উৎস কুরআন এবং হাদিস।

শারী'য়াহর শাব্দিক অর্থ: 'শারী'য়াহ্' একটি আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ দ্বীন, জীবন-পদ্ধতি, ধর্ম, জীবন আচার, নিয়ম- নীতি ইত্যাদি। তবে আরবী ভাষায় শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল - পানির উৎসস্থল বা যে স্থান থেকে পানি উৎসারিত হয়ে গড়িয়ে পড়ে এবং মানুষ সেখানে এসে পানি পান করে পিপাসা নিবারণ করে।

শারী'য়াহ্ হলো যা বান্দাহর জীবন পরিচালনার জন্য আল্লাহ তা'আলা বিধিবদ্ধ করেছেন। যেমন বলা হয়: الشارع যার অর্থ হল الطريق الأعظم)বড় রাস্তা), আবার যখন ঘরের দরজা রাস্তার দিক দিয়ে খোলা থাকে তখন বলা হয়- شرع المنزل অর্থাৎ বড় রাস্তামুখী করে সে ঘর তৈরী করেছে। আরো বলা হয় - شرعت في هذا الأمر شروعًا অর্থাৎ এ বিষয়ে আমি অনুসন্ধান শুরু করেছি। পশু যখন পানি পান করতে ঘটে নামে বলা হয়, وشرعت الدواب في الماء، وتشرع

.إذا دخلت: شرعًا অর্থাৎ পশু পানিতে প্রবেশ করেছে।
শারী'য়াহ্ হলো জীবন বিধান।

:لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾]المائدة
٤٨]

"তোমাদের প্রত্যেকের জন্য শরী'য়াহ ও জীবন-পদ্ধতি নির্ধারণ করেছি।" [সূরা আল-মায়িদাহ: ৪৮]

শরী'য়াহর পারিভাষিক অর্থ:

والشريعة الإسلامية في الاصطلاح ما شرعه الله لعباده من العقائد والعبادات

والأخلاق والمعاملات ونظم الحياة في شعبها المختلفة لتحقيق سعادتهم في الدنيا

.والآخرة

"মহান আল্লাহ তা'আলা বান্দার জীবন ও জগত পরিচালনার জন্য যে আক্বিদা, ইবাদত, আখলাক, লেনদেন ও জীবন ব্যবস্থা প্রদান করেছেন, যা তাদের ইহকালীন ও পরকালীন শান্তি বাস্তবায়ন করে তা-ই হল ইসলামী শরীয়াহ্"।

ইসলামী শারীয়াহর উৎস

ইসলামী শরী'য়াহর মূল উৎসসমূহ

প্রথম উৎস: আল-কুরআনুল কারীম:

ইসলামী শরী'য়াহ এর সর্বপ্রথম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উৎস হচ্ছে আল-কুরআনুল কারীম। এটি ক্রিয়ার মাসদার। এর শাব্দিক অর্থ: জমা করা, একত্র করা। অতঃএব, القراءة অর্থ: উচ্চারণে এক হরফকে আরেক হরফের সাথে মিলানো। আল-কুরআনকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অবতীর্ণ কিতাব নামে খাস করা হয়েছে। ফলে কুরআনকে কিতাব বলা হয়। কতিপয় উলামা বলেছেন, আল্লাহর কিতাবসমূহের মধ্যে এ কিতাবকে কুরআন বলার কারণ হলো এটা অন্যান্য সব কিতাবের সারাংশ, বরং সব ইলমের সারমর্ম এতে একত্রিত হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপারে বলেছেন:

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ)

[يوسف :١١١]

"তাদের এ কাহিনীগুলোতে অবশ্যই বুদ্ধিমানদের জন্য রয়েছে শিক্ষা, এটা কোনো বানানো গল্প নয়, বরং তাদের পূর্ববর্তী

কিতাবের সত্যায়নকারী এবং প্রতিটি বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ।
আর হিদায়াত ও রহমত ঐ কওমের জন্য যারা ঈমান আনে।"

[সূরা ইউসুফ: **১১১**]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন,

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَنًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى

لِلْمُسْلِمِينَ ﴾]النحل :٨٩[

"আর স্মরণ কর, যেদিন আমি প্রত্যেক উম্মতের কাছে, তাদের থেকেই তাদের বিরুদ্ধে একজন সাক্ষী উত্থিত করব এবং তোমাকে তাদের উপর সাক্ষীরূপে হাযির করব। আর আমি তোমার উপর কিতাব নাযিল করেছি প্রতিটি বিষয়ের স্পষ্ট বর্ণনা, হিদায়াত, রহমত ও মুসলিমদের জন্য সংবাদস্বরূপ"। [সূরা আন-
নাহল: ৮৯]

আল-কুরআন হলো দ্বীনের মূলভিত্তি, ইসলামি শরী'য়াহর মূল উৎস, সর্বযুগে ও সর্বদেশে এটি আল্লাহর সুস্পষ্ট দলিল।

সাহাবাগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের থেকে তিলাওয়াত, হিফয, অর্থ পড়া ও এ অনুযায়ী আমল করা ইত্যাদি সরাসরি গ্রহণ করেছেন।

সুন্নাহ ও শরীয়াহ আইনে এর অবস্থান:

সুন্নাহ এর শাব্দিক অর্থ পথ, পদ্ধতি ও জীবন চরিত; চাই তা প্রশংসনীয় হোক বা নিন্দনীয়। এ শব্দটির ব্যবহার আল-কুরআনে ও হাদীসে এ অর্থে এসেছে। যেমন: আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

(سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا

[الاسراء :٧٧]

"তাদের নিয়ম অনুসারে যাদেরকে আমি আমার রাসূলদের মধ্যে তোমার পূর্বে পাঠিয়েছিলাম এবং তুমি আমার নিয়মে কোনো পরিবর্তন পাবে না"। [সূরা আল-ইসরা: ৭৭]

:سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴾]الفتح

[٢٣

"তোমাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে তাদের ব্যাপারে এটি আল্লাহর নিয়ম; আর তুমি আল্লাহর নিয়মে কোনো পরিবর্তন পাবে না"। [সূরা আল-ফাতহ: ২৩]

তৃতীয়ত: আল-ইজমা' :

الإجماع :هو اتفاق جملة أهل الحل والعقد من أمة محمد ﷺ في عصر من الأعصار، على

.«حكم واقعة من الوقائع

ইজমা' হচ্ছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর পর
মুসলিম উম্মাহর মুজতাহিদগণ কোনো এক যুগে শরী'য়াহ এর কোনো এক বিধানের উপর একমত হওয়া।

মুসলমানগণ একমত যে, ইজমা' শরী'য়াহ এর দলিল, প্রত্যেক মুসলিমের উপর এ অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব। কুরআন ও সুন্নাহ থেকে ইজমা দলিল হওয়ার প্রমাণ:

আল-কুরআনে এসেছে:

وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ

نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾]النساء :١١٥[

"কারো নিকট হেদায়াত প্রকাশ হওয়ার পর সে যদি রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মুমিনদের পথ ব্যতীত অন্য পথ অনুসরণ করে, তবে যেদিকে সে ফিরে যায় সেদিকেই তাকে ফিরিয়ে দেব এবং জাহান্নামে তাকে দগ্ধ করব।" [সূরা আন-নিসা: ১১৫]

روي عن النبي ﷺ قال :أمتي لا تجتمع على الخطأ، سألت الله ألا يجمع أمتي على الضلالة فأعطانيه، ومن سره بحبوحة الجنة فليتزم الجماعة، ومن فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة .«الإسلام من عقه

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আমার উম্মত ভুলের উপর একমত হবে না। আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করেছি তিনি যেন আমার উম্মতকে ভ্রষ্টতার উপর কখনো একমত না করেন। ফলে আল্লাহ আমার দো'য়া কবুল করেছেন। তাই যে জান্নাতের স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করতে চায় সে যেন জামা'আতের সাথে থাকে। আর যে ব্যক্তি জামা'আত থেকে সামান্য পরিমাণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, সে তার ঘাড় থেকে ইসলামের রশিকে ছিন্ন করল (অর্থাৎ ইসলাম থেকে দূরে সরে গেল)"।

চতুর্থ: আল-ক্বিয়াস:

القياس في اصطلاح الأصوليين هو تسوية واقعة لم يرد نص يحكمها بواقعة ورد نص يحكمها في الحكم الذي ورد به النص لتساوي الواقعتين قل علة هذا الحكم.

কিয়াস হচ্ছে কোনো বিষয়ের জন্য সে বিধান নির্ধারণ করা, যে বিধান স্পষ্টভাবে অন্য একটি বিষয়ের জন্য কুরআন বা হাদীসে বর্ণনা করা আছে, উভয় বিষয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধানকারী 'ইল্লাত' বা হেতু থাকার কারণে।

অধিকাংশ ফিকহবিদগণ একমত যে, কিয়াস শরীয়তের দলিল, এর দ্বারা আহকাম সাব্যস্ত করা হয়।

জমহুর উলামা কিরাম কিয়াস শরীয়তের দলিল হওয়ার অনেক হাদীস উল্লেখ করেছেন, তন্মধ্যে কয়েকটি হলো: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে সাওম অবস্থায় স্ত্রীকে চুম্বন করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত উত্তরে বলেছিলেন:

أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ بِمَاءٍ وَأَنْتَ صَائِمٌ؟

"যদি তুমি সাওম অবস্থায় কুলি করো তাতে কি সাওম ভঙ্গ হবে? (অর্থাৎ সাওম অবস্থায় পানি দিয়ে কুলি করলে যেমন সাওম ভাঙ্গে না, তেমনি স্ত্রীকে চুম্বন করলেও সাওম ভাঙ্গে না)। এটা ছিল রাসূলের পক্ষ থেকে উম্মতকে কিয়াস শিক্ষা দেয়া।

[' মাসাদিরুত তাশরী' ফিমা লা নসসা ফিহি, লেখক: আব্দুল ওয়াহহাব খাল্লাফ, পৃষ্ঠা নং ১৬]

ইসলামী শারীয়াহর মূল উপাদান

ইবাদত (উপাসনা)

যেমন নামাজ, রোজা, হজ এবং যাকাতের বিধান।

মুআমালাত (সামাজিক ও আর্থিক লেনদেন):

ব্যবসা-বাণিজ্যের নিয়ম।

বিবাহ, তালাক এবং উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিধি।

ঋণ, চুক্তি এবং সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা।

আখলাক (নৈতিকতা): ভালো চরিত্র গঠন এবং খারাপ আচরণ থেকে বিরত থাকার নির্দেশনা।

উকুবাত (শাস্তি):
অপরাধ এবং এর জন্য নির্ধারিত শাস্তি। যেমন: হত্যা, চুরি, মিথ্যা অভিযোগ ইত্যাদির জন্য শাস্তির বিধান।

আদালত (ন্যায়বিচার):
ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য শরীয়াহর নির্দেশনা অনুসারে আদালতের ভূমিকা।

ইজমা (সম্মিলিত ঐক্যমত্য):

ইসলামী পণ্ডিতদের সম্মিলিত মত।

কিয়াস (তুলনামূলক বিশ্লেষণ):

কুরআন ও হাদিসের আলোকে নতুন সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করা।

শরীয়াহর লক্ষ্য (Maqasid al-Shariah):

শরীয়াহর উদ্দেশ্য হলো মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করা এবং জীবনকে শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল করা। এর মূল লক্ষ্য পাঁচটি:

ধর্মের সংরক্ষণ: ধর্ম পালনের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা।

জীবনের সংরক্ষণ: মানুষের জীবন রক্ষা করা। বুদ্ধির সংরক্ষণ: মানুষের জ্ঞান ও চিন্তাশক্তি রক্ষা করা।

সম্পদের সংরক্ষণ: সম্পত্তির সুরক্ষা।

বংশধারার সংরক্ষণ: পরিবার ও সমাজের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা।

শরীয়াহের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য

এটি সর্বজনীন এবং চিরন্তন। এটি ন্যায্যতা, সহমর্মিতা এবং ভারসাম্যের ভিত্তিতে গঠিত। এটি ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের প্রতিটি দিককে কভার করে। এটি শুধু মুসলিমদের জন্য নয়, বরং মানবজাতির কল্যাণের জন্যও প্রযোজ্য।

শরীয়াহ হলো আল্লাহর দেওয়া ঐশী আইন, যা নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর মাধ্যমে মানবজাতিকে প্রদান করা হয়েছে এবং যা মুসলমানদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নৈতিকতা ও বিধি-ব্যবস্থা নির্দেশ করে।

শরীয়তের কর্তৃত্ব: মৌলিক কিছু কথা

সেকুলারিজমের রাজনৈতিক দর্শন হলো ধর্ম ও রাষ্ট্র আলাদা থাকবে।

ধর্ম হলো সৃষ্টি ও স্রষ্টার মাঝে আধ্যাত্মিক সম্পর্কের নাম। সামাজিক জীবনের বৃহৎ অঙ্গনে এর প্রভাব অনুপস্থিত। এই ধ্যান-ধারণা ইসলামের সাথে মৌলিকভাবে সাংঘর্ষিক। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান। মানুষের জীবনের প্রতিটা স্তর ইসলামের দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত। কেবল বান্দা আর রবের মধ্যকার দায়িত্বসমূহ পালনেই ইসলাম সীমাবদ্ধ নয়। এক মানুষের সাথে অন্য মানুষের সম্পর্ক কেমন হবে এবং মুসলিমদের মধ্যকার সংঘাতে ফয়সালা কীভাবে হবে তাও ইসলামে বলা আছে।

ইসলামের রয়েছে এ শরয়ী সুবিস্তৃত রূপরেখা যেটা সেকুলারিজম পছন্দ করে না। কেবল দীন বা ওহীর প্রাধান্য বা কর্তৃত্ব থাকবে, যেটা সকলে অনুসরণ করবে এমনটা ইসলাম সমর্থন করে না।

শরীয়তের কর্তৃত্বের ধারণা

শরীয়তের কর্তৃত্ব কিংবা শরীয়তকে বিধান বলে মেনে নেওয়া বেশ কিছু ক্ষেত্রকে অন্তর্ভুক্ত করে। যথা-

প্রথম ক্ষেত্র: আকীদা। একজন মুসলিম মনে করবে যে, আল্লাহ যা হালাল করেছেন তা হালাল আর তিনি যা হারাম করেছেন তা হারাম। শরয়ী বিধি- বিধান প্রণয়ন কেবল আল্লাহই করবেন। সৃষ্টিজগতের স্রষ্টা যেমন আল্লাহ, দীন অবতীর্ণকারী এবং শরীয়ত প্রণয়নকারীও তিনিই।

দ্বিতীয় ক্ষেত্র: কর্ম। অর্থাৎ আল্লাহ ও তার রাসূলের আদেশ-নিষেধ মেনে

চলা। ইসলামের আদব-আখলাক অনুসরণ করা। শরীয়তের বিধি-বিধান নিছক হালাল-হারামে বিশ্বাস করা এবং শরীয়তের আদেশ-নিষেধ মেনে চলার মাঝে সীমাবদ্ধ নয়। বরং বাস্তবায়নও এর অংশ। এখানে এসেই মুসলিমদের মাঝে বড় ফারাক সৃষ্টি হয়। যে ব্যক্তি আল্লাহর আদেশ-নিষেধ যত বেশি মানে সে তত আল্লাহর অনুগত।

যত বেশি মেনে চলে, তার সীমারেখা যত বেশি অনুসরণ করে, সে তত বেশি আল্লাহর বিধানের অনুগত। তবে মৌলিকভাবে আল্লাহর আনুগত্য সবার মাঝে থাকা আবশ্যক।

তৃতীয় ক্ষেত্র: আইন প্রণয়ন। অর্থাৎ বিচারকার্য পরিচালিত হবে শরয়ী রীতি-নীতি অনুযায়ী। শরীয়তই মুসলিমদের রক্ত, অর্থ, অধিকার ও দায়িত্বের মাঝে চূড়ান্ত ফয়সালা করে দিবে। শরয়ী হুকুম বাস্তবায়ন বা শরীয়তের কর্তৃত্ব বলতে সাধারণত এটিই উদ্দেশ্য। কারণ এ যুগে এসে মানুষের মাঝে এটি নিয়ে বিরোধ দেখা গিয়েছে। এক্ষেত্রে মূলকথা হলো, মানুষ যে আইন প্রণয়ন করবে তা ওহীর নির্দেশের অনুগামী হতে হবে।

শরীয়তের কর্তৃত্ব এ সকল ক্ষেত্রকে ব্যাপ্ত করে। আকীদা, বাস্তব জীবন, আইন-সবকিছুই এর অন্তর্গত। তবে বর্তমান যুগে এসে বিষয়টি আইন প্রণয়নের সাথে নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছে। কারণ ইসলামী বিশ্বের সর্বত্র লোকজন ইসলামী আইন অনুসরণ ছেড়ে দিয়ে মানব রচিত আইন অনুসরণ শুরু করেছে। তাই শরীয়ত বাস্তবায়ন বলতে স্বাভাবিকভাবে এটিই উদ্দেশ্য।

আর আইন প্রণয়নের বিষয়টি যেহেতু সামাজিক জীবনকে ব্যাপ্ত করে, সেহেতু এটিকে সেকুলারিজম নাকচ করে। কিন্তু বিশ্বাস আনা বা নিজের কর্মে প্রকাশ করা ব্যক্তিগত পর্যায়ে সীমিত। তাই এর সাথে সেকুলারিজমের কোনো সংঘাত হয় না।

সুতরাং একজন মুসলিমের করণীয় হলো অশ্লীলতাকে হারাম বলে বিশ্বাস করা। পাশাপাশি অশ্লীলতা থেকে নিষেধ করা এবং কেউ এমন কাজ করলে শাস্তি দেওয়ার আইনেও বিশ্বাসী হওয়া। এছাড়াও তাকে অশ্লীলতা থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে এই নির্দেশনা মেনে চলতে হবে। তাকে অশ্লীলতার বিরোধিতা এবং অশ্লীলতায় অভিযুক্ত ব্যক্তিদের শাস্তি প্রদানের বিষয়টিও মানতে হবে।

শরীয়তের কর্তৃত্বের প্রমাণ যে-সকল শরয়ী মূলনীতি

শরীয়তের বিধি-বিধানের প্রতি আত্মসমর্পণ এবং সেগুলো বাস্তবায়নের আবশ্যকতার পক্ষে অনেক শরয়ী দলীল বিদ্যমান। এটি একটা অকাট্য মূলনীতি যার উপর মুসলিমরা সবাই একমত। মুসলিমদের মাঝে মতভেদ হয়নি এতটুকুই বলব না; বরং বলব যে, মুসলিমদের ইতিহাসে কখনো এটি অস্বীকার করার কথা ভাবনাতেও আসেনি। কারণ শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে এটি মেনে নেওয়াটা স্বতঃসিদ্ধ। এর পক্ষে অসংখ্য দলীল বিদ্যমান। আমরা তিনটা মূলনীতি উল্লেখ করব। যথা-

প্রথম মূলনীতি: শরীয়তের বিচার মানার আবশ্যকতা

এর পক্ষে কুরআনের অনেক আয়াত আছে। আল্লাহ তার শরীয়ত অনুসরণের নির্দেশ দিয়ে বলেন,

وأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ) [المائدة :٤٩] (

"আর তাদের মাঝে আল্লাহর অবতীর্ণ বিষয় দিয়ে বিচার করুন। আপনি আপনার প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না। তাদের থেকে সাবধান থাকুনযাতে তারা আপনার উপর আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তার কোনো কিছু থেকে বিচ্যুত করতে না পারে। "[সূরা আল-মায়েদা ৫:৪৯]

★ শরীয়তের বিধান থেকে যারা সরে যায় তাদের নিন্দায় আল্লাহ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ (يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ] (النساء :٦٠

"আপনি কি তাদেরকে দেখেননি যারা দাবি করে তারা আপনার উপর অবতীর্ণ এবং আপনার উপর পূর্ববর্তীদের উপর অবতীর্ণ বিষয়ের উপর ঈমান এনেছে। তারা চায় তাগুতের কাছে বিচার করতে, অথচ তারা আদিষ্ট হয়েছে তাগুতের কুফরী করার ব্যাপারে।" [সূরা আন-নিসা ৪:৬০]

★ যিনি শরীয়তের বিধান ছাড়া অন্য বিধানের অন্বেষণ করেন তার নিন্দায় তিনি বলেন,

"তারা কি أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ] (المائدة) :٥٠) জাহেলিয়াতের বিধান চায়? দৃঢ় বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহ থেকে উত্তম কোনো বিচারক আছে কি?" [সূরা আল-মায়েদা ৫:৫০]

★ যারা আল্লাহর রাসূলকে বিচারক মানে না তাদেরকে ঈমানহীন ঘোষণা করে আল্লাহ বলেন,

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ] (النساء :٦٥

"না, আপনার রবের কসম! তারা ততক্ষণ ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যকার মতভেদের বিষয়ে আপনাকে বিচারক না বানায়।" [সুরা আন-নিসা ৪:৬৫]

★ আল্লাহর বিধান অনুযায়ী যারা বিচার করে না তাদের ক্ষেত্রে কুফরী, যুলুম ঘুম ও ও ফুসুকের বহুকুম দেয়,

"আল্লাহর অবর্তীর্ণ বিষয় ছাড়া যারা বিচার করে না, তারা কাফের" [সূরা আল- মায়েদা ৫:৪৪[

هُمُ الظَّالِمُونَ) "তারা যালেম" [সূরা আল-মায়েদা ৫:৪৫ (الْفَسِقُونَ هم "তারা ফাসেক" [সূরা আল-মায়েদা ৫:৪৭]।

★যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসূলের মতো করে কারো আনুগত্য করে, সে যেন তাকে রব হিসেবে গ্রহণ করল।

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ] (التوبة :٣١

"তারা আল্লাহ ছাড়া তাদের পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগীদেরকে তাদের রব হিসেবে গ্রহণ করেছে।" [সূরা আত-তাওবা ৯:৩১]

★ আল্লাহ ও তার রাসূলের সিদ্ধান্তের বিপরীতে কোনো মুসলিমের সিদ্ধান্ত নেওয়ার এখতিয়ার থাকতে পারে না।

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ

أمرهم] (الأحزاب :٣٦

"আল্লাহ ও তার রাসূল কোনো ফয়সালা দিলে কোনো মুমিন নর-নারীর জন্য বাছাই করার এখতিয়ার নেই।" [সূরা আল-আহযাব ৩৩:৩৬]

এ সকল অকাট্য কুরআনী দলীল প্রমাণ করে যে, শরয়ী বিধি-বিধান অনুযায়ী বিচার পরিচালনা করা মুসলিমদের উপর ওয়াজিব। কোনো মুসলিম কল্পনাও করতে পারে না যে, ব্যভিচার হালাল, যেখানে আল্লাহ সেটি হারাম করেছেন। সে কখনো ভাবতেই পারে না যে, শরীয়ত ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা বিচার হতে পারে। এসব কিছু শরীয়তের হুকুম।

যিনি ব্যভিচার হারাম করেছেন, তিনিই শরয়ী দণ্ড আবশ্যক করেছেন। সুতরাং কীভাবে ব্যক্তিগত পর্যায়ে ব্যভিচার বৈধ মনে করা হতে পারে? তাকে শাস্তি না দিয়ে থাকা যেতে পারে? অথচ দুইটাই শরীয়তের বিধান। এগুলো আসলে কিছুই না, কেবলই সেকুলারিজমের প্রভাব।

দ্বিতীয় মূলনীতি: শরয়ী বিধি-বিধান আবশ্যক-করণ

কুরআন-সুন্নাহর অসংখ্য দলীল-প্রমাণ থেকে একজন মুসলিম বুঝতে পারে যে, শরয়ী বিধি-বিধান বাধ্যতামূলক হওয়াটা অকাট্য শরয়ী মূলনীতি।

প্রথম দলীল: বিচারের বিধি-বিধান

বিচারকার্য শরীয়তের প্রসিদ্ধ দায়িত্ব। এর পক্ষে কুরআন-সুন্নাহর দলীল বিদ্যমান। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তৎপরবর্তী খলীফারা এ দায়িত্ব পালন করেছেন। বিচারকার্য বলতে বোঝানো হয় বিবাদমান গোষ্ঠীর মাঝে মীমাংসা করা এবং তাদের উপর বিধি-বিধানের আবশ্যকতা আরোপ করা। অর্থাৎ শরয়ী বিধি-বিধান নিছক ব্যক্তিগত ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল নয়, যার কোনো আইনগত প্রয়োগ নেই।

দ্বিতীয় দলীল: সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধ

এর অর্থ হলো সৎকাজের নির্দেশ দেওয়া এবং অসৎকাজ করতে নিষেধ করার বৈধতা। বিষয়টি নিছক সৎকাজ-অসৎকাজ জানার মাঝে সীমাবদ্ধ নয়, বরং আদেশ-নিষেধ করাও উদ্দেশ্য। সুতরাং শরীয়তেরদ্বিতীয় দলীল: সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধ

এর অর্থ হলো সৎকাজের নির্দেশ দেওয়া এবং অসৎকাজ করতে নিষেধ করার বৈধতা। বিষয়টি নিছক সৎকাজ-অসৎকাজ জানার মাঝে সীমাবদ্ধ নয়, বরং আদেশ-নিষেধ করাও উদ্দেশ্য। সুতরাং শরীয়তের বিধি-বিধান ব্যক্তি ও সমাজ উভয় পর্যায়ে বাস্তবায়িত হবে।

তৃতীয় দলীল: শরয়ী দণ্ডসমূহ

যেমন- ব্যভিচার, মদ্যপান, অপবাদ ইত্যাদির দণ্ড প্রয়োগ। এর দাবি হলো, শরয়ী বিধি-বিধান বাস্তবায়নের আবশ্যকতা এবং ব্যক্তি ও সমাজে এর কার্যকারিতা থাকা। অর্থাৎ ব্যক্তি কেবল হারাম ত্যাগ এবং ওয়াজিব পালনের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং যে এর বিরোধিতা করবে তার উপর শাস্তিও প্রয়োগ করবে।

চতুর্থ দলীল: আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার পরবর্তী খলীফারা জিহাদ করে অনেক অঞ্চল দখল করেছেন। পূর্ব-পশ্চিমের বহু স্থানে তারা ইসলামী বিধান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। জিহাদের উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর কালেমা উড্ডায়ন করা এবং ইসলাম অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করা। এর থেকে বোঝা যায়, শরয়ী বিধি-বিধান বাস্তবায়ন করা আবশ্যক, তা কেবল ব্যক্তিগত বিশ্বাসে সীমাবদ্ধ নয়।

তৃতীয় মূলনীতি: মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের সাথে জড়িত শরীয়তের বিস্তারিত বিধানসমূহ

শরীয়তের বহু শাখা-প্রশাখা আছে যেগুলো নিছক ব্যক্তি পর্যায়ে সীমাবদ্ধ করা সম্ভব নয়। সেগুলো মানুষদের মধ্যকার সম্পর্কের সাথে জড়িত। যেমন- বিবাহ, মীরাস, মুয়ামালাত, দিয়ত, অপরাধ প্রভৃতি। এগুলো ব্যক্তি পর্যায়ে সীমাবদ্ধ বিধি-বিধান নয়। এগুলো বাস্তবায়নের একটাই উপায় আর সেটি হলো শরয়ী বিধি-বিধান সবার উপর প্রযোজ্য হওয়া। যেমন, 'দিয়ত'; এটি শরীয়ত কর্তৃক ঘোষিত একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ, যা মানুষের জীবনের বিনিময়।

শরীয়তের কর্তৃত্ব লঙ্ঘনকারী বিষয়সমূহ

শরীয়তের কর্তৃত্ব একটা গুরুত্বপূর্ণ শরয়ী মূলনীতি। এই কর্তৃত্ব লঙ্ঘিত হয় এমন কিছু আছে। এমন কিছু বিষয় হলো।শরীয়তের কর্তৃত্ব লঙ্ঘনকারী বিষয়সমূহ

শরীয়তের কর্তৃত্ব একটা গুরুত্বপূর্ণ শরয়ী মূলনীতি। এই কর্তৃত্ব লঙ্ঘিত হয় এমন বেশ কিছু বিষয় আছে। এমন কিছু বিষয় হলো-

প্রথমত, শরীয়তের বিধানের আবশ্যকতায় বিশ্বাস না করা

এটি কয়েকভাবে হতে পারে-

• প্রথম চিত্র, এই বিশ্বাস রাখা যে, শরীয়ত আবশ্যকীয় কোনো বিধান প্রণয়ন করেনি। এটি হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল বলার নামান্তর মাত্র। এ যেন দীনের আবশ্যকীয় বিষয় নাকচ করা।

• দ্বিতীয় চিত্র, এই বিশ্বাস রাখা যে, শরীয়তের বিধান বাধ্যতামূলক না। অর্থাৎ শরীয়তের বিধি-বিধান মানতে হবে কিন্তু সবার উপর সেটি চাপিয়ে দেওয়া যাবে না। এটিও আগের মতই দীনের আবশ্যকীয় বিষয় নাকচ করার মতো।

• তৃতীয় চিত্র, এই বিশ্বাস রাখা যে, শরীয়ত এ যুগে আবশ্যক না। কারণ শরয়ী আবশ্যকতার বিষয়টি ঐতিহাসিক বিষয়। এখন আর সেটি প্রযোজ্য নয়। এটিও অকাট্য বিষয় অস্বীকার করার মতো।

দ্বিতীয়ত, শরীয়তের সাথে আংশিক বা পুরোপুরি সাংঘর্ষিক মানবরচিত আইন দিয়ে বিচারকার্য পরিচালনা

শরীয়তের অকাট্য বিধি-বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক আইন প্রবর্তন করা শরীয়তের বিচার লঙ্ঘন করার শামিল। কারণ মুসলিমদের দায়িত্ব হলো কুরআন-সুন্নাহর বিধানের কাছে সমর্পণ করা। শরয়ী কর্তৃত্ব তখনই সবচেয়ে বেশি লঙ্ঘিত হয় যখন ইসলামের বিধি-বিধানের বদলে শরীয়তের সাথে সাংঘর্ষিক আইন দিয়ে বিচার সম্পাদন করা হয়।

আমরা যখন কোনো আইনের ক্ষেত্রে বলি সেটি শরীয়তের সাথে সাংঘর্ষিক, তখন আমরা বোঝাতে চাই শরীয়তের অকাট্য বিধানের সাথে তা বিরোধপূর্ণ। যেমন- বিভিন্ন অশ্লীলতা ও মদের বৈধতা প্রদান, শরয়ী দণ্ড (হদ্দ) বাতিল করা, শরয়ী অকাট্য ওয়াজিব বাদ দেওয়া। শরীয়তের আইন অর্থ এমন না যে, শরীয়ত যে-সকল বিষয়কে বিবেচনায় নিয়েছে শুধু সেগুলো শরয়ী আইনের অন্তর্ভুক্ত হবে।

বরং শরীয়ত যা নাকচ করেনি তাও শরীয়তে বৈধ। এ দিক থেকে আইনের ক্ষেত্র বিস্তৃত। শরীয়ত যা কিছু নাকচ করেনি, তা সবই শরয়ী দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য। শরীয়ত যে-সকল মাসলাহা (কল্যাণ) নাকচ করেনি, সেগুলো সব শরীয়তে বৈধ।

তৃতীয়ত, শরীয়তের সাথে সাংঘর্ষিক বিভিন্ন মতবাদ গ্রহণ করে নেওয়া

শরীয়তের দ্বারা বিচারের আবশ্যকতাকে নাকচ করে এমন বিভিন্ন মূলনীতি গ্রহণ করা। এর মাধ্যমে ব্যক্তির মনে শরীয়তের সাথে সাংঘর্ষিক বিভিন্ন মতবাদের জন্ম দেয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, যদি কেউ মনে করে ব্যক্তি স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে যদিও সেটা শরীয়তবিরোধী কথা। আবার মনে করা, দুনিয়াবী জীবনে রাষ্ট্রের আইন চলবে, দীনি বিষয় শুধু শরীয়তের।

রাষ্ট্র ও ধর্মের বিচ্ছেদের রোজনামচা

রাষ্ট্র ও ধর্মের বিচ্ছেদের ধারণাটা কি আসলে সামঞ্জস্যপূর্ণ?

সভ্য আর অসভ্য সমাজের মধ্যে পার্থক্য ধরা হয় আইনের শাসনের প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাবকে। কিন্তু পশ্চিমা বিশ্বে আমরা কী দেখি? যখন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য অর্জিত হয় তখন ট্রাম্প থেকে শুরু করে উগ্র বামপন্থী, সবাই আইনের শাসনের কথা বলে। কিন্তু কোনো কিছু যখন তাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে যায় তখন তারা আইন বদলানোর কথা বলা শুরু করে।

এ ক্ষেত্রে তারা একটা পূর্ব-ধারণার ওপর ভিত্তি করে কথা বলে। সেই ধারণাটা হলো, কোনো কিছু বৈধ হওয়া আর নৈতিকভাবে ভালো হওয়া এক না। অনেক কিছু বৈধ হতে পারে, কিন্তু তার মানে এই না যে সেটা ভালো। আবার অনেক কিছু আইন অনুযায়ী অবৈধ হতে পারে। তার মানে এই না যে সেটা খারাপ।
অর্থাৎ ভালোমন্দের চূড়ান্ত ফায়সালা করে দেয় নৈতিকতা, আইনের শাসন না।

প্রশ্ন হলো, এই নৈতিকতার ভিত্তি কী হবে?

নৈতিকতা এত গুরুত্বপূর্ণ হলে, নৈতিকতা আর এর ভিত্তি নিয়ে আরও বেশি আলোচনা হওয়া দরকার না? ভালোমন্দ, মানবজীবনের লক্ষ্য, পবিত্রতা, শুদ্ধাচার আর ভ্রষ্টাচার-এগুলো নিয়ে আরও কথা হওয়া দরকার না?

কিন্তু আমরা এ ধরনের আলোচনা দেখা যায় না। কারণ, নৈতিকতা হলো ধর্মের আলোচনার জায়গা। নৈতিকতার আলোচনা আনতে গেলে ইসলামকে আনতে হবে। আর সেক্যুলার রাষ্ট্রে যেহেতু আইনকে ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হতে দেয়া যাবে না, তাই ইসলামী শরীয়াহর বিধানকে দূরে রাখার জন্য এই আলোচনাকেও দূরে রাখতে হয়।

কিন্তু তাহলে আবার সেই পুরোনো প্রশ্নে ফিরে যেতে হয়। আইনের ভিত্তি অন্তর্নিহিত নৈতিকতা। কিন্তু সেই নৈতিকতার ভিত্তি কী?

কোনো-না-কোনো নৈতিকতা, কোনো-না-কোনো মাপকাঠি তো লাগবেই। কিন্তু এ প্রশ্নগুলো শুধু 'অন্যায্য আইন' নিয়ে প্রতিবাদ করার সময় আলোচিত হয়।

আধুনিক রাষ্ট্রে ইসলামী শাসননীতির সমস্যা

রাষ্ট্রের আধুনিক রূপের মাঝে ইসলামী শাসন প্রয়োগের বিষয়ে বড় ধরনের মতভেদ দেখা দিয়েছে। বর্তমান যুগে অনেকে মনে করেন যে, ইসলাম শাসননীতি আধুনিক রাষ্ট্রের বর্তমান রূপের সাথে খাপ খায় না। এই নিষেধাজ্ঞা তিনটি ভিতের উপর নির্ভর করে, যেগুলো একটা অন্যটার সাথে।

সম্পৃক্ত। যথা:

প্রথমত, নৈতিক ভিত্তি।

দ্বিতীয়ত, আইন প্রণয়নের ভিত্তি।

তৃতীয়ত, ফিকহী ভিত্তি।

আধুনিক রাষ্ট্রের রূপ কীভাবে সেকুলারিজমের ইসলামিকরণ মেনে নিতে উদ্বুদ্ধ করে।

প্রথমত: নৈতিক ভিত্তি

বিষয়টি উপস্থাপন করে সবচেয়ে খ্যাতি কুড়িয়েছেন 'আদ-দাউলাতুল মুস্তাহীলাহ' (The Impossible State) বইয়ের লেখক ড. ওয়ায়েল হাল্লাক। তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তা হলো, শরীয়াহ এই আধুনিক রাষ্ট্রে বাস্তবায়িত হওয়া সম্ভব নয়। কারণ এই রাষ্ট্রের ভিত শরয়ী নীতির সাথে মিলতে পারে না। এক্ষেত্রে তার সবচেয়ে বড় নির্ভরতার জায়গা ছিল নৈতিক ভিত্তি।

আধুনিক রাষ্ট্র ইউরোপের প্রেক্ষাপটে সৃষ্ট এক রাষ্ট্রব্যবস্থা। ইসলামী শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রীয় পরিধির চাইতে এর ক্ষেত্র ভিন্ন।

ইসলামী শাসনে কেন্দ্রীয় পরিধি হলো নৈতিক প্রতিপালন।
[দেখুন জর্ডান ব্রানশ, আদ-দাউলাতুল থারায়েত্বিয়্যাহ (৯৩-৯৪), (১০৫), (১১৯-১২৩)। (১৫৬)]

হাল্লাক আধুনিক রাষ্ট্র ও শরীয়াহর মাঝে তুলনার বিষয়টা খুব সংক্ষেপে তার শ্যীবন বইয়ে আলোচনায় এনেছে।

হাল্লাক উল্লেখ করেছেন যে, ইসলামী শাসন কিছু নৈতিক, আইনী রাজনৈতিক, সামাজিক ও মেটাফিজিক্যাল ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত যেগুলো আধুনিক রাষ্ট্র থেকে পুরোপুরি ভিন্ন। ইসলামী শাসন কিছু নৈতিক মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এর রয়েছে সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক কাঠামো। শরীয়াহ যত ভূমিতে প্রয়োগ করা হয়, সবই ইসলামী ভূমি বলে বিবেচ্য হয়। সেখানে আল্লাহর ইচ্ছার উপরে কারো ইচ্ছা প্রাধান্য পায় না। কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্রের অবস্থা এর বিপরীত। এর নিজস্ব লক্ষ্য-উদ্দেশ্য আছে। আধুনিক রাষ্ট্রের এমন সার্বভৌমত্ব আছে যা দিয়ে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর মাঝে প্রভাব বিস্তার করে সেগুলোকে নিজের অধীন করে নেয়। রাষ্ট্রীয় লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের বাইরে যেকোনো কিছু অপ্রাসঙ্গিক এবং গৌণ। নৈতিক ভিত্তির অনুপস্থিতির অন্যতম পরিণতি হলো, আধুনিক রাষ্ট্র দুট বিষয়ের মাঝে পার্থক্য করে-বর্তমানে যা আছে আর ভবিষ্যতে যা ঘটবে। বর্তমানে যে আইন আছে তা যথেষ্ট। তাই অন্য কোনো কিছুর সাথে (যেমন- সত্য বা ঐশী নির্দেশ) খাপ খাইয়ে নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা নেই। আইনগুলে বাস্তবায়িত হবে, সেগুলো নৈতিক হোক কিংবা না-ই হোক। কিন্তু ইসলাম শাসনে এমনটা কল্পনা করা যায় না। সত্য আর মূল্যবোধ কিংবা আইন আর নৈতিকতার মাঝে পার্থক্যের কোনো অস্তিত্ব ইসলামে নেই।

আধুনিক রাষ্ট্রের পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের কথা হাল্লাক উল্লেখ করেছেন, যেগুলো ছাড়া আধুনিক রাষ্ট্র কল্পনা করা যায় না। সেগুলো হলো:

১) আধুনিক রাষ্ট্র একটি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা থেকে সৃষ্ট। এটি ইউরোপীয় ইতিহাসের ফল। ইউরোপীয় ইতিহাসের ঘটনা পরম্পরা একে নির্মাণ করে দিয়েছে।

২) সুউচ্চ সার্বভৌমত্বের উপস্থিতি। অর্থাৎ এমন সার্বভৌমত্ব থাকবে যার উপরে কোনো ক্ষমতা নেই। চূড়ান্ত ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব রাষ্ট্রের হাতে থাকবে। এই কর্তৃত্ব নির্ধারণ করে দিবে নাগরিকদের পরিচয়। এর জন্য জীবন বিসর্জন দেওয়ার মানসিকতা তৈরি করা হবে।

মোদ্দাকথা, একজন বিশ্বাসী যেমন সৃষ্টিকর্তার গুণাবলির উপর বিশ্বাস করে, তেমনিভাবে রাষ্ট্রেরও একটা অতিপ্রাকৃত কর্তৃত্ব বিদ্যমান।

৩) সহিংসতা এবং আইনপ্রণয়নের একচ্ছত্র অধিকার। আইন প্রণয়ন মূলত কর্তৃত্বের নির্দেশক। কর্তৃত্বের প্রকাশ হিসেবে ইচ্ছামত আইন প্রণয়ন করা যাবে, সহিংসতা ও বলপ্রয়োগের সীমারেখা নির্ধারণ করা যাবে এবং আইনের সীমা অতিক্রম করা ব্যক্তিদের উপর কী শাস্তি প্রযোজ্য তাও বলা হবে।

৪) রাষ্ট্রের আমলাতন্ত্র। সমাজের সকল কিছু পরিচালনার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের যে চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণ, সেটি এখানে উদ্দেশ্য। জন্ম থেকে মৃত্যু, শিক্ষা, চিকিৎসা, কর্মক্ষেত্র, কর নির্ধারণ, বিনোদন প্রভৃতি সকল কিছুতে রাষ্ট্রীয় ভূমিকার উপস্থিতি।

৫) সাংস্কৃতিক প্রভাব। রাষ্ট্র সমাজে সাংস্কৃতিকভাবে হস্তক্ষেপ করে। রাষ্ট্রের কাজ নিজের শৃঙ্খলা রক্ষার মাঝে সীমিত নয়, বরং রাষ্ট্রের ভেতর রাষ্ট্র ছাড়া অন্য কোনো স্বতন্ত্র কাঠামোকে অস্তিত্বে থাকতে দেয় না।

[আদ-দাউলাতুল মুস্তাহীলাহ (৩৯-৪০), (৪৪-৪৯)। আদ-দাউলাতুল মুস্তাহীলাহ (৬৩-৭৩)।]

হাল্লাকের কথার উপসংহার হলো, কিছু ইসলামপন্থী আধুনিক রাষ্ট্র সম্পর্কে যে ধারণা রাখে সেটি সত্য নয়। তারা মনে করে যে, আধুনিক রাষ্ট্র নিরপেছ এটিকে ব্যবহার করে যেমন জনগণের উপর স্বৈরাচার প্রতিষ্ঠা করা যায়, তেমন। আবার জনগণের ইচ্ছাও এতে প্রতিফলিত হয়। এটি সেক্যুলার ডেমক্রেটিক সমাজতান্ত্রিক বা ইসলামী রাষ্ট্র হতে পারে। সেক্ষেত্রে শাসকদের ইচ্ছা। কর্তৃত্ব অনুযায়ী পরিচালিত হবে। তাদের এ ধারণা ভুল। বরং আধুনিক রাষ্ট্রের মাঝে এমন কিছু মেটাফিজিক্যাল বিষয় সন্নিবেশিত আছে যেগুলো এ রাষ্ট্রের প্রজার অধিকারের মাত্রাই নির্ধারণ করে দেয়।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো, আধুনিক রাষ্ট্র এমন স্থির বিষয় নয় যা কখনো পরিবর্তিত হয় না, বদলে যায় না কিংবা পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য কাজ করে চলে না। এমন বহু পরিবর্তন আধুনিক রাষ্ট্রে হয়ে থাকে। কিন্তু উল্লিখিত এ সকল পরিবর্তনের কোনোটির কারণে ইসলামী শাসনের মৌলিক শর্তাবলির সাথে সামঞ্জস্য বিধান হয় না, বরং ইসলামী শাসন থেকে ক্রমে আরো দূরে সরে যায়।

আধুনিক রাষ্ট্রে ইসলামী শাসন বাস্তবায়ন করা অসম্ভব; কেননা আধুনিক রাষ্ট্র নৈতিকতার ভিত থেকে বিচ্ছিন্ন। তার বক্তব্য অনুসারে আধুনিক রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের কোনো নৈতিক ভিত নেই।

দ্বিতীয়ত: আইন প্রণয়নের ভিত্তি

এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আধুনিক আইন প্রণয়নের পন্থা শরীয়াহ অনুযায়ী শাসন করার নীতির সাথে খাপ খায় না। শরীয়াহ যদি আধুনিক রাষ্ট্রের অধীনে কিছু আইন প্রণয়নে সীমাবদ্ধ করে ফেলা হয় তাহলেই শাসনব্যবস্থা 'ইসলামী' হয়ে যাবে না। এর সাথে পূর্বে উল্লিখিত নৈতিক

ভিত্তির সম্পর্ক আছে। তবে শরীআহকে আলাদাভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন; কেননা এর সাথে আধুনিক রাষ্ট্রের একটা উপকরণের সম্পর্ক আছে আর সেটি হলো আইনে রূপান্তর।

বর্তমান যুগের ফকীহরা শরীয়াহকে 'আইনে রূপান্তর' করার বিধান প্রসঙ্গে মতভেদ করেছেন। কেউ কেউ এটিকে বৈধ বলেছেন, কেউ আবার নিষেধও করেছেন। প্রত্যেক পক্ষের শরয়ী দলীল বিদ্যমান। সবাই মাসলাহা- মাফসাদার (কল্যাণ-অকল্যাণ) উপর নির্ভর করে মত দিয়েছেন।

[রেফারেন্স :বিষয়টিতে মতভেদ এবং উভয় পক্ষের মতামত জানতে দেখুন রাফে কাইসীর 'নাযারাত ফী তাক্বনীনিল ফিকহিল ইসলামী' (১৯৯-২৬৪), হাইসাম রুমীর 'আস-সিয়াগাতুল ফিকহিয়্যাহ ফিল আসরিল হাদীস' (৪৩৫-৪৫৫), মুহাম্মাদ ফায়েযের 'তাক্বনীনল আহকাম আল-ক্বাদ্বাইয়্যাহ' (৫৭-৯৮), নাসের আল-মাইমানের 'আন-নাওয়াযেল আত-তাশরীইয়্যাহ (৮৯-১৩৩)]

তবে আমরা এখানে যে ভিত্তির আলোচনা পেশ করছি তার সাথে পূর্ববর্তী ফিকহী মতভেদের সম্পর্ক থাকলেও স্পষ্ট পার্থক্য আছে। ফিকহী মতভেদটা ছিল কল্যাণ-অনিষ্টের উপর ভিত্তি করে বিষয়টির বৈধতা-অবৈধতা নিয়ে। যিনি নিষেধ করেন, তিনি এর শরয়ী বৈধতা আছে বলে মনে করেন না। কারণ এখানে বিচারককে এমন বিচারের নির্দেশ দিতে বাধ্য করা হয়, যেটা তার দৃষ্টিতে যথাযথ নাও হতে পারে, পাশাপাশি এতে নানা প্রকার অনিষ্ট হয়। সুতরাং যিনি এটিকে নিষিদ্ধ মনে করেন, তার অবস্থানের চাইতে আমরা যে আলোচনা পেশ করছি সেটির প্রসঙ্গ ভিন্ন।

বিষয়বস্তুর নির্ভরতার দিক থেকে ভিন্নতাটা হলো, ঐ ব্যক্তি শরয়ী দলীলের উপর নির্ভর করে 'আইনে রূপান্তর' করার প্রক্রিয়ায় অনিষ্টের কথা বলে। বিপরীতে এই অবস্থান মূলত আধুনিক রাষ্ট্রে 'আইনে রূপান্তর'-এর ধরনের সাথে সম্পৃক্ত একটা কারণের উপর নির্ভর করে।

আর বিবরণ ও প্রভাবের দিক থেকে ভিন্নতার প্রসঙ্গ খুঁজলে দেখা যাবে তাতে কোনো পার্থক্য নেই। এই বিচার যে 'ইসলামী বিচার' কিংবা 'শরীয়াহ অনুযায়ী বিচার' সেভাবে বিবরণ প্রদান করার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নেই। এর কারণ দুটি:

প্রথমত: মতভেদটা এমন বিষয়ে যা নিয়ে মতভেদ বৈধ। সুতরাং এটি বৈধ মতভেদের ক্ষেত্র। যিনি এটি হারাম মনে করেন, তিনি বৈধতাকে একটা বৈধ ফিকহী মতভেদ হিসেবে গণ্য করেন।

দ্বিতীয়ত: যিনি নিষিদ্ধ মনে করেনঃ তিনি যদি বলে থাকেন যেন, বৈধতার মত প্রদান করা যাবে না, র মত অনুযায়ী শরীয়াহকে 'আইনে রূপান্তর' করা হারাম থাকবে। কিন্তু বিচারিক নির্দেশ শরীয়তেরই নির্দেশ। একটা ভুল বা হারামে জড়িয়ে গেলে কোনো বিচার থেকে 'শরীয়াহ অনুযায়ী বিচার'-এই বৈশিষ্ট্য বাতিল হয়ে যাবে না।

তবে তারা যে সকল সমস্যা উত্থাপন করে, সেগুলোকে 'আইনে রূপান্তর' করার সম্ভাব্য ক্ষতিসমূহের সাথে যুক্ত করা হবে। এই নমুনায় কোনো স্পষ্ট অনিষ্ট থাকবে না, কিংবা বেশি থাকবে।

শরীয়তকে আইনে রূপান্তর করার ক্ষেত্রে দুই ধরনের সমালোচনা আছে যেগুলোর সাথে বিষয়টির কোনো প্রকার সম্পর্ক নেই। সেগুলো হলো:

প্রথম ধরন: যে আইন শরীয়তকে একটা নির্দিষ্ট দিকে সীমাবদ্ধ করে ফেলে তার সমালোচনা। পশ্চিমা উপনিবেশ যে আইনের ধারণা নিয়ে এসেছে তার একটা সমস্যা হলো, তা শরয়ী বিচারব্যবস্থাকে খণ্ড-খণ্ড করে ফেলে। একটা নির্দিষ্ট দিক বা অঙ্গনে হলো পারিবারিক আইন। রাষ্ট্র সেই অঙ্গন এমনভাবে নির্ধারণ করে সেটি যাতে করে রাষ্ট্রের কল্যাণ সুনিশ্চিত হয়। [ইয্যত হুসাইন, সিয়াসাতু তাকনীনিশ শরীয়াহ (২৮-৩০), (৬৭-৬৮)। আদ-দাউলাতুল মুস্তাহীলাহ (১৯-২০)]

এক্ষেত্রে সমালোচনাটা হবে শরীয়তকে আইনে রূপান্তর করার ক্ষেত্রে একটা নির্দিষ্ট বাস্তবতার ক্ষেত্রে। নিঃসন্দেহে এভাবে আইনে রূপ দেওয়াটা কোনোভাবে শরয়ী বিধি-বিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে না। কেননা এতে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে শরীয়তকে নির্বাচন করা হয় আর বাকি ক্ষেত্রগুলোতে সেটিকে প্রত্যাখ্যান করা হয়। এর দ্বারা উদ্দেশ্য শরীয়ত অনুযায়ী শাসন নয়, বরং অন্যান্য কল্যাণ নিশ্চিত করা। এমন আইন প্রণয়নের সমালোচনা, এর নেতিবাচক দিক তুলে ধরা এবং শরীয়াহর ব্যাপারে মুসলিমদের চিন্তা- ধারণার উপর এর প্রভাবের আলোচনা ভিন্ন।

দ্বিতীয় ধরন: আইন প্রণয়নকে কাজে লাগিয়ে কিছু করার সাথে সম্পৃক্ত। আইন প্রণয়ন আইন থেকে নিরপেক্ষ কোনো বিষয় না। কোনো রাজনৈতিক লক্ষ্য বা ঈপ্সা থেকে মুক্ত নিছক আইন চর্চার নাম নয়। বরং এটি কর্তৃত্ব চর্চার একটা ঈপ্সিত পদ্ধতি। ফকীহ ও আলিমদের কাজকর্মকে সীমাবদ্ধ করার একটা উপকরণ হলো শরীয়তকে 'আইনে রূপান্তর'।[ওয়ায়েল হাল্লাক, হাল ইউমকিনু ইস্তিয়াদাতুশ শরীয়াহ, আশ-শরীয়াতুল ইসলামিয়্যাহ ম্যাগাজিন, (৪৬)]

মোটাদাগে কথাটা ঠিক। আইন প্রণয়নের কাজে যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহার হতে পারে, সেটি অনস্বীকার্য। তবে এটি আইন প্রণয়ণের সাথে
বিশিষ্ট নয়। যে কোনো কর্তৃত্ব বা ক্ষমতারই অপব্যবহার সম্ভব। সুতরাং দিবে, যেটা এই ক্ষতি হ্রাস করে এমন দেয়। এটি আইন প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট আবশ্যক কোনো বৈশিষ্ট্য না। আর যদি হয়েও থাকে তবু এটি কোনো আইন বা বিধানকে 'ইসলামী' বিধানে পরিণত হওয়াকে বাধাগ্রস্ত করবে না। অনুরূপভাবে নির্দিষ্ট কিছু নিয়মকানুন বা বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে আলোচনা করার সময় সেগুলোতেই সীমিত থাকা বাঞ্ছনীয়। 'আইনে রূপান্তর'-এর আলোচনায় চলে যাওয়া অনুচিত।

বর্তমান যুগে শরীয়তকে আইনে পরিণত করতে গিয়ে বাস্তব কিছু প্রচেষ্টার ভুল থাকায় সেগুলোর সমালোচনা করাটা একই পর্যায়ে পড়বে। কারণ এ ধরনের ভুলের সাথে সরাসরি আইনী প্রক্রিয়ার কোনো সম্পর্ক নেই।

তৃতীয়ত: ফিকহী ভিত্তি

এই ভিত্তি দেখিয়ে দেয় যে, আধুনিক রাষ্ট্রে বেশ কিছু ফিকহী বিধান বাস্তবায়ন করা অসম্ভব। প্রাচীন রাষ্ট্রগুলোতে ইসলামের প্রয়োগ উপস্থাপনের মাধ্যমে জানান দেয় যে, প্রাচীন ফিকহী বিধানগুলো আধুনিক রাষ্ট্রে প্রয়োগের অনুপযোগী। এটিই সবচেয়ে স্পষ্ট ও সূক্ষ্ম পদ্ধতি। কারণ এটি স্পষ্ট পার্থক্য এবং অনুঘটকের উপর নির্ভর করে। বর্তমান যুগের অধিকাংশ মানুষ এ পন্থা অবলম্বন করে।

আমরা সংক্ষেপে সে সকল ফিকহী বিধি-বিধান ও বৈশিষ্ট্য উপস্থাপন করব যেগুলো আধুনিক রাষ্ট্র দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। যথা:

১- আঞ্চলিকতা:
এর দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, প্রতিটা রাষ্ট্রের নির্ধারিত সীমারেখা বা অঞ্চল থাকবে। অথচ মুসলিমদের জন্য একজন ইমামের অধীনে ঐক্যবদ্ধ হওয়া আবশ্যক। কিন্তু দ্বিতীয় হিজরী শতক থেকে মুসলিমরা বহু শাসক থাকার বাস্তবতা মেনে নিয়েছে প্রয়োজনে ও কল্যাণের স্বার্থে। সুতরাং এই বিষয়টি নিয়ে কোনো সমস্যার অবকাশ নেই।

২. নাগরিকত্ব:

এর দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, অধিকার ও কর্তব্য একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। এটি প্রাচীন যুগের রাষ্ট্রের বহুত্ব থেকে ভিন্ন। কারণ এখানে একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলকে কেন্দ্র করে অধিকার জড়িত হয়ে পড়ে। আধুনিক রাষ্ট্র জন্ম নেওয়ার পর এই নতুন চিত্র দেখা দিয়েছে। এর নাম 'জাতিসত্তা রাষ্ট্র'। ইসলামের ইতিহাসে এমন রাষ্ট্র অনুপস্থিত। শাসক ও রাষ্ট্রের ভিন্নতা থাকলে একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলকে কেন্দ্র করে অধিকার ও কর্তব্যের এমন নজির নেই। ৩- আন্তর্জাতিক আইন: অর্থাৎ রাষ্ট্রগুলো কিছু সাধারণ আইন-কানুন মানতে বাধ্য। শরীয়তের সাথে সাংঘর্ষিক কিছু আইন মানতে রাষ্ট্রগুলো আপত্তি করতে সমর্থ হলেও অনেক আইনের ক্ষেত্রে সেটি
করতে সক্ষম হয় না।

৪- দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শক্তি:
এরা যে-কোনো শরয়ী বিধান প্রতিষ্ঠার চেষ্টাকে বাধাগ্রস্ত করে। পশ্চিমা মূল্যবোধের বাইরে যেকোনো নমুনাকে ব্যর্থ করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। এটি আধুনিক রাষ্ট্রের মৌলিক কোনো বৈশিষ্ট্য নয়, বরং এটি আধুনিক রাষ্ট্রের বহিঃস্থ বিষয়, যা রাষ্ট্রের সক্ষমতা ও সম্ভাব্যতার সাথে সম্পৃক্ত।

৫- রাষ্ট্রের আমলাতন্ত্র:
আধুনিক রাষ্ট্র জনগণের কাজকর্ম পর্যবেক্ষণ করা, নজরদারি করা এবং তাদের কাজে প্রভাব ফেলার জন্য বহু উপাদান ব্যবহার করে। জীবনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়ে হস্তক্ষেপের ক্ষমতা আধুনিক রাষ্ট্রের রয়েছে। এটিকে বলা হয় রাষ্ট্রের সর্বব্যাপিতা। বস্তুত এই বৈশিষ্ট্য শরীয়াহর সাথে সাংঘর্ষিক নয়। পূর্ববর্তী শাসনপদ্ধতিগুলোতে এমন ছিল না, আর বর্তমান রাষ্ট্রে আছে বলেই যে তা শরীয়াহর সাথে সাংঘর্ষিক হবে এমনটা বোঝায় না। বরং এই নজরদারি ও পর্যবেক্ষণের নানান ধরন রয়েছে। যে সমস্ত কল্যাণ- অকল্যাণ আছে, সেগুলোর বিধান এক নয়। তবে স্মরণ রাখতে হবে যে, এমন নজরদারির পদ্ধতি বহু অনিষ্টের কারণ। এই সমস্যাগুলো থেকে বাঁচার জন্য বিকল্প হিসেবে ভিন্ন জিম্মাদারির ব্যবস্থা করতে হবে।

৬- সার্বভৌমত্ব:
এর দ্বারা উদ্দেশ্য চূড়ান্ত কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব। চূড়ান্ত কর্তৃত্ব যখন রাষ্ট্রের হাতে থাকে তখন রাষ্ট্রই নির্ধারণ করে দেয় কী করা যাবে আর কী করা যাবে না। শরীয়ত অনুযায়ী যদি রাষ্ট্র শাসন করে তবুও সে সিদ্ধান্ত রাষ্ট্র নিজ ইচ্ছাতেই বাছাই করেছে।

তবে বাস্তবে এটি শরয়ী বিধানের উপর প্রভাব ফেলে না। শরীয়তের অনুসরণ যদি করা হয়েই থাকে তাহলেই তো শরীয়তের কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে নেওয়া হলো। ফলে শাসনব্যবস্থাও

শরীয়তসম্মত ও যথাযথ বলে গণ্য হবে। এতে কোনো প্রকার সমস্যা নেই। শাসনকার্য পরিচালনার সময় যত প্রকার সীমালঙ্ঘন বা বিচ্যুতি সংঘটিত হবে সেগুলোর সমালোচনা করা হবে।

৭- আইন প্রণয়ন:

কারণ তখন শরীয়ত হয়ে পড়ে সরকারের হাতে থাকা একটা উপকরণ মাত্র। এর জবাব আগেরটার মতই। যদি আইন প্রণয়নের মাধ্যমে শরীয়ত বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় তাহলে এই 'আইন প্রণয়ন' বিষয়টি শরীয়াহর অধীন। আইনটা একজন মানুষ প্রণয়ন করেছে-সেটি সমস্যাজনক না। সকল বিচার তো মানুষের হাতেই থাকে। যত রকম সীমালঙ্ঘন বা অপব্যবহার হয়ে থাকে সেগুলোর সমালোচনা করা যেতে পারে, কিন্তু নিছক আইন তৈরি করা সমস্যাজনক নয়।

৮- অর্থনীতি:

এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আধুনিক রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক অর্থনীতির অনুগত থাকে। শরীয়তের সীমারেখা মেনে চলে না। এটি এক প্রকার অর্থনীতি-নির্ভর শাসনব্যবস্থা যা অর্থের লেনদেনের ক্ষেত্রে শরয়ী সীমারেখার অনুগামী হয় না। আর এর বাইরে অবস্থান করে আর্থিক লেনদেন করা সম্ভব হয় না।

৯- মানুষের স্বাভাবিক জীবনাচরণের সাথে সংশ্লিষ্ট স্বাধীনতাসমূহ:

ইসলামের ইতিহাসে না থাকলেও বর্তমানে মানুষের মাঝে এমন বহু আধুনিক স্বভাব ও কার্যক্রম দেখা যায় যেগুলো শরীয়াহর সাথে সাংঘর্ষিক। এ কারণে শরয়ী বিধানগুলো পুরোপুরি বাস্তবায়ন করা অনেক সময় কঠিন হয়ে যায়। স্থান-কালের ভিন্নতা অনুযায়ী এটি বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। যেমন- অমুসলিম সংখ্যালঘুদের সাথে আচরণের ধরন। এ সকল মৌলিক ক্ষেত্রে আধুনিক রাষ্ট্রের সাথে ইসলামী বিধানের সংঘর্ষ দেখা যায়। তবে সবগুলো আরোপিত অভিযোগ মেনে নেওয়া হয়নি, যেমনটা পূর্বের আলোচনায় স্পষ্ট। আর প্রতিটা উপাদান নিয়ে আলোচনা করার মতো সুযোগ নেই।

ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে পৃথক করা

এমনইভাবে কিছু মানুষ বলে বসে, সেকুলারিজমের অর্থ ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে পৃথক করা, ধর্মকে সমাজ থেকে পৃথক করা না।

এটিকে অন্যভাবে বলতে গেলে এভাবে বলা যায়, সেকুলারিজমের একটা রাজনৈতিক দিক আছে যেটা ধর্মের সাথে শত্রুতা করে না। আরেকটা বিশ্বাসগত ও জ্ঞানগত সামগ্রিক দিক আছে যেটা ধর্মের কট্টর বিরোধী।

এ কথা বলার অর্থ একই কথাকে ভিন্নভাবে বলা। কথাটার অর্থ হলো, সেকুলারিজম বলতে ধর্মকে জীবন থেকে তুলে দেওয়া বা সমাজে উপস্থিত না হতে দেওয়া নয়।

আমরা এখানে এসে পুনরায় একই উত্তর বলব। যে সেক্যুলারিজম বলতে বোঝায়, ধর্মকে পুরোপুরি তুলে দেওশা, সেটি বাস্তবে সেক্যুলারিজমের সাথে সংশ্লিষ্ট না।

বরং আমাদের বিরোধ এমন সেকুলারিজমের সাথে যেটা ধর্মকে পরিচালনাকারী এক পৃথক রাজনৈতিক কাঠামো প্রদান করে। যেটা ধর্মকে জনজীবনে প্রভাব বিস্তারে বাধা দেয়। রাষ্ট্র ও ধর্মকে পৃথক করার মূলভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। তবে এদের মাঝে স্তরভেদ আছে। কেউ কেউ খুবই কট্টর-রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতায় বিশ্বাস করে এবং জনজীবন থেকে ধর্ম দূরে আবশ্যকতায় বিশ্বাস করে। আবার কেউ কেউ খুব উদার- অবস্থান করারার স্বীকৃতি দেয় এবং জনজীবনে ধর্মের উপস্থিতি কোনোভাবে সেকুলারিজমের সাথে সাংঘর্ষিক নয় এমনটা বিশ্বাস রাখে।

★ আল্লামা মুসতফা সাবারি" রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে পৃথক করা আর দীনে ইসলাম আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ এই দুই বিশ্বাস কখনো এক হতে পারে না।'

তিনি আরো বলেন, 'কোনো মুসলমান যদি তার সাধারণ সামাজিক জীবনে দীনের এই কর্তৃত্ব মেনে না নেয় যে, দীন তাকে আদেশ ও নিষেধ প্রদান করবে এবং তার কার্যাবলির মধ্যে দখল দেবে, তা হলে সে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায়। এক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি কীভাবে খারিজ হবে না, যে রাষ্ট্রীয় জীবনে এই কর্তৃত্ব এবং এই দখলদারত্ব মেনে না নেবে!

★ আল্লামা জাহেদ কাউসারি রহিমাহুল্লাহ বলেন, রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে পৃথক করার প্রচেষ্টা সুস্পষ্ট কুফুর।

[রেফারেন্স: তাফসির ইবনে কাসির, ৩:১৩১ তুর্কি ইসলামি চিন্তাবিদ- (১৮৬৯-১৯৫৪) মাওকিফুল আকল-২৮০

মাওকিফুল আকল ৪:২৯৪

মাকালাতুল কাউসারি, হুকমু মুহাওয়ালাতি ফাসলিদ দীন: ৩৩০-৩৩১, প্রকাশনা: আল মাকতাবাতুত তাওফিকিয়্যাহ]

রাষ্ট্রের আবার ধর্ম কি?

রাষ্ট্রধর্মের ব্যাপারটা কেমন? বিশেষ করে আধুনিক রাষ্ট্রে?

কেতাবি চালে বলা যায়, রাষ্ট্রধর্ম হল এমন কোন ধর্মীয় অবস্থান বা বিশ্বাস যা রাষ্ট্র আনুষ্ঠানিক ও সরকারীভাবে সমর্থন ও অনুমোদন করে।

অন্যান্য ধর্মের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু সেক্যুলার রাষ্ট্রে 'রাষ্ট্রধর্ম' ইসলাম দাবি করা একটা অক্সিমোরন। দুটি পারস্পরিক সাংঘর্ষিক এবং বিপরীতমুখী ধারণাকে জোর করে মেলানোর চেষ্টা।

শাসন, সার্বভৌমত্ব, আইন প্রণয়ন, বিচার, প্রতিটি ক্ষেত্র থেকে ইসলামকে হটিয়ে দিয়ে সেক্যুলার রাষ্ট্র নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। সেক্যুলার রাষ্ট্র অগণিত বিষয়ে সরাসরি ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক অবস্থান গ্রহণ করে। এমনকি ইসলামের যে অবস্থান সেটাকে 'অবৈধ' কিংবা 'বেআইনি' সাব্যস্ত করে। সেক্যুলার রাষ্ট্র বাই ডিফল্ট ধর্মহীনতার অবস্থান থেকে কাজ করে। এমন রাষ্ট্রের ঘোষিত আদর্শ, মূল্যবোধ, আইন, কোন কিছুর সাথে ইসলামের দূরতম কোন সম্পর্ক থাকে না।

এমন একটা সেটআপের সামনে 'রাষ্ট্রধর্ম' ইসলাম লাগিয়ে রাখা কার্যত অর্থহীন। তার ওপর যদি কোন রাষ্ট্রের সংবিধানে স্পষ্টভাবে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলা হয় তাহলে রাষ্ট্রধর্মের বিষয়টা তাত্ত্বিক এবং শাব্দিকভাবে অর্থহীন হয়ে যায়। যেমন কোন দেশের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম কিন্তু রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি ধর্মনিরপেক্ষতা। এর অর্থ কী? কার্যত কিংবা শাব্দিক কোন দিক থেকেই এর কোন সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থ হয় না।

সেক্যুলার রাষ্ট্রের সামনে এই ধরণের 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম'-এর সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে রাখার আসলে একটা কৌশল। মুসলিমরা যেন ইসলামী শাসন না চায়, তা নিশ্চিত করার জন্য কোনরকম বুঝ দিয়ে রাখা। বাংলাদেশের সেক্যুলাররা 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলামের বিষয়টাকে রাষ্ট্রের

‘ইসলামীকরণে’-এর উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করতে চায়। কিন্তু আদতে এটা সেক্যুলারায়নের বেশ কার্যকরী একটা পদ্ধতি।

হুট করে ইসলামকে সরিয়ে দেয়া হলে জনমতের ওপর সেটার প্রভাব নেতিবাচক। এক্ষেত্রে ইসলামের অবস্থান থেকে শাসক ও শাসনের বৈধতা নিয়ে চিন্তা শুরু হবার ঝুঁকিটাও থেকে যায়। অন্যদিকে অলঙ্কারিক রাষ্ট্রধর্মকে মূলোর মতো ঝুলিয়ে নির্বিঘ্নে এগিয়ে নেয়া যায় সেকুল্যার প্রজেক্টকে। এবং বাস্তবে তাই হয়, হয়ে আসছে।

এমন একটা বাস্তবতায় রাষ্ট্রধর্ম বাদ দেয়া হবে নাকি হবে না – সেই প্রশ্ন আসলে তেমন গুরুত্বপূর্ণ না। কারণ দু ক্ষেত্রেই মূল গতিপথ এক ও অভিন্ন, সমাজ, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির আরো বেশি সেক্যুলারায়ন। পার্থক্য সামান্য এবং সেটা অ্যাপ্রোচে, মৌলিক কিছু না।

‘যা আছে তা অন্তত রক্ষা করি’; এ মনোভাবে থেকে কেউ কোন নির্দিষ্ট ঘটনার বিরোধিতা করতেই পারেন। কিন্তু কারো পুরো চিন্তা, দর্শন, কর্মকান্ড যদি কেবল এসব মৌসুমী ‘আন্দোলন’-কেন্দ্রিক হয়, যদি রাজনীতির অর্থ হয় কেবল এমন ইস্যুতে অস্তিত্ব জানান দেয়া, তাহলে সেটা একধরণের ইন্টারনালাইযড সেক্যুলারিজম।

ব্যাপারটা অনেকটা উৎসাহ-আয়োজন নিয়ে বারবার পাতানো জুয়ায় হেরে যাওয়া, তারপর চেচামেচি করা, তারপর 'পরেরবার জিতবো, বলার মতো। এই অ্যাপ্রোচ সমাধান তো আনেই না, বরং সমস্যাকে জিইয়ে রাখে, আরো প্রকট করে, এবং ভবিষ্যত প্রজন্মকেও এই পাতানো জুয়ায় আবদ্ধ ও আসক্ত করে ফেলে।

তার ওপর এই অলঙ্কারকে পুঁজি করে কেউ যদি সেক্যুলার রাষ্ট্র ও শাসন বৈধতা দেয়, তাহলে তখন ব্যাপারটা আরো গুরুতর সমস্যায় পরিণত হয়। .ইসলামের অবস্থান থেকে আমাদের উচিৎ সেক্যুলার রাষ্ট্রব্যবস্থার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করা, ইসলামী শাসনের কথা বলা, সাধারণ মুসলিমদের সচেতন করা, জনমত তৈরি করা এবং এই দাবি এবং একে প্রতিষ্ঠা করার মতো ক্ষমতা তৈরি করা। সেক্যুলারিযমের মূর্তি ভাঙ্গতে না পারলে কমপক্ষে মূর্তি যে ভাঙ্গতে হবে সেই বোধ ও চিন্তা তৈরি করা। সেক্যুলার রাষ্ট্র কতোটুকু ইসলামকে বৈধতা দেবে সেটা আমাদের আলোচনার মূল কেন্দ্রবিন্দু হওয়া উচিৎ না।

আকিদা বিশ্বাস ও সেক্যুলার রাষ্ট্র:

আকীদা-বিশ্বাসের কোন বিষয়গুলো ধর্মীয় দৃষ্টিতে অনুমোদিত সেটি সেকুলার রাষ্ট্র নির্ধারণ করে দেয়। সেকুলার রাষ্ট্রই বলে দেয় শরীয়তের কোন ব্যাখ্যাগুলো অনুসরণযোগ্য। আইন অনুযায়ী কোন কাজগুলো সমর্থন পাওয়ার যোগ্য আর কোনগুলো শাস্তির উপযুক্ত তা নির্ধারণের জন্য 'সভ্য সমাজের উপযুক্ত' আর 'ধর্মীয় দৃষ্টিতে সিদ্ধ' বলে কাজকে শ্রেণিতে বিভক্ত করার অধিকারও তার। কোন বিষয়টি ব্যক্তিগত জীবনে থাকবে আর কোনটা জনপরিসরে প্রবেশের অধিকার রাখবে, সেটি নির্ধারণ করা সেকুলার রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

ধর্মের উপর সেকুলারিজমের প্রভাবের আরেকটা নমুনা হলো ব্যক্তিগত জীবনের বাইরে গিয়ে জনপরিসরে পৃথক জীবনের ধারণা তৈরি। জাতীয় জীবন বা জনপরিসরে (Public Sphere) কিছু শিষ্টাচার ও মূল্যবোধ রক্ষা করতে হবে। আর সেকুলার রাষ্ট্রই নির্ধারণ করে দিবে যে ধর্মের কোন বিষয়গুলো জনপরিসরের অন্তর্ভুক্ত হবে।

ধর্মের উপর এই সেকুলার প্রভাব মিডিয়ার মাধ্যমেও হয়। মিডিয়া ধর্মের যে বিষয়গুলো সেকুলারিজমের সাথে খাপ খায় বলে মনে করে সেগুলোকে তুলে ধরে। কারণ এই মিডিয়া রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে। ফ্রান্সের সমাজবিজ্ঞানীরা বিষয়টি তুলে ধরেছেন। দার্শনিক জন বিবেরো বলেন,

'গত পঁচিশ বছর ধরে সেকুলারিজম মিডিয়ার তৈরি অনেক 'ইস্যুর' উপর নির্ভর করেছে। রাজনীতিবিদরা কেবল দ্বিতীয় পর্যায়ে গিয়ে হস্তক্ষেপ করেছে, যখন তারা নিজেদেরকে বারবার মিডিয়ার সামনে আবিষ্কার করেছে। কেউ কেউ যখন এই ইস্যুগুলো ব্যবহার করেছে, ঠিক তখন অন্য অনেকে মিডিয়ায় বাস্তবতাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা মিডিয়ার আবেগ-অনুভূতির বিপরীতে যাওয়ার ঝুঁকি গ্রহণ করতে সম্মত হয়নি।

কিছু কিছু বিষয়ের দিকে তেমন ভ্রুক্ষেপই করা হয় না, কারণ মিডিয়ায় এমনভাবে সেগুলোকে উপস্থাপন করা হয় যেন মানুষের সম্মান রক্ষার সাথে

[রেফারেন্স: হুসাইন আজরামা মুসাআলাতুল আলমানিয়্যা' (১১৯-১২০), (৩২৯-৩৩০)]

মুসাআলাতুল আলমানিয়্যা (১৫০-১৫১)।

জনপরিসরের বিভিন্ন শিষ্টাচার ও মূলনীতি এবং আধুনিক আইনে এর প্রভাব জানতে পড়ুন সামীর তানাগুর 'আন-নাযারিয়্যাতুল আম্মাহ লিল-কানুন'। জন বিবেরো, আল-আলমানিয়্যা আল-মুযাইয়্যাফা]

আরব ও ইসলামী বিশ্বে ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির কিছু নমুনা

• **মিসর:** নেপোলিয়ন বোনাফোর্ট এর আক্রমনের সাথে মিসরে ধর্মনিরপেক্ষতার অনুপ্রবেশ ঘটে। আল-জিবরিতি তাঁর ইতিহাসগ্রন্থে (মিসরের উপর ফরাসি হামলা ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাপ্রবাহ শীর্ষক অংশে) এমনই ইঙ্গিত দিয়েছেন। তিনি তাঁর লেখায় এমন কিছু শব্দ ব্যবহার করেছেন যা স্যাকুলারিজম তথা ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের অর্থ বহন করে। যদিও তিনি এ শব্দটি সরাসরি ব্যবহার করেননি। যিনি সর্বপ্রথম 'ইলমানিয়্যাহ্' বা স্যাকুলারিজম পরিভাষাটি ব্যবহার করেছেন তিনি হচ্ছেন- কাতারের অধিবাসী খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী ইলিয়াস; ১৮২৭ সালে প্রকাশিত আরবী-ফরাসি অভিধানে। খিদীভ (মিশরের শাসকদের উপাধি) ইসমাঈল ১৮৮৩ সালে ফ্রান্সের আইন মিসরে প্রবেশ করান। এই খিদীভ প্রাশ্চাত্য-সংস্কৃতির অন্ধভক্ত ছিলেন। তাঁর স্বপ্ন ছিল মিসরকে ইউরোপের একটি টুকরোতে পরিণত করবেন।

• **ভারত:** ১৭৯১ সাল পর্যন্ত ভারতে ইসলামি আইন (শরিয়া) মোতাবেক শাসনকার্য পরিচালিত হয়েছে। এরপর ইংরেজদের প্ররোচনায় ক্রমান্বয়ে ইসলামি আইন বিলুপ্ত করা শুরু হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে সম্পূর্ণভাবে ইসলামি আইন বিলুপ্ত করা হয়।

আলজেরিয়া: ১৮৩০ সালে ফ্রান্স কর্তৃক উপনিবেশ শাসনের স্বীকার হওয়ার পর ইসলামি আইন বিলুপ্ত করা হয়।

• **তিউনিশিয়া:** ১৯০৬ সালে তিউনিশিয়াতে ফ্রান্সের আইন স্থান করে নেয়।

মরক্কো: ১৯১৩ সালে মরক্কোতে ফ্রান্সের আইন অনুপ্রবেশ করে।

• **তুরস্ক:** ইসলামি খেলাফত বিলুপ্ত হওয়ার পর এবং মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক কর্তৃক সর্বক্ষেত্রে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারের পর তুরস্ক স্যাকুলারিজমের চাদর পরিগ্রহ করে করে। যদিও তারও আগ থেকেই কিছু কিছু লক্ষণ ও কর্মকাণ্ড দেখা দিয়েছিল।

• **ইরাক ও সিরিয়া:** উসমানী খিলাফত আমলে ইরাক ও সিরিয়া থেকে ইসলামি আইন বিলুপ্ত করা হয় এবং সেখানে ইংরেজ ও ফরাসিদেরকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

• **আফ্রিকার অধিকাংশ অঞ্চল:** দখলদার উপনিবেশী শক্তির পতনের পর আফ্রিকার অনেক দেশে খ্রিস্টান রাষ্ট্রপ্রধানেরা ক্ষমতা দখল করে নেয়।

• ইন্দোনেশিয়া ও দক্ষিণ এশিয়ার অধিকাংশ দেশ স্যাকুলার রাষ্ট্র।

• স্যাকুলার ও জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দলের বার্থ পার্টি, সিরিয়ান জাতীয়তাবাদী দল, ফেরাউনি মতবাদ, তুরানি মতবাদ, আরব জাতীয়তাবাদ।

সেক্যুলারিজমের স্বরূপ বাংলাদেশের সংবিধান

সেক্যুলারিজম কি? আমাদের দেশে সংবিধানে এর স্বরূপ কি ছিলো? এ বিষয়গুলো শুধু সচেতন আলেমে দ্বীন হিসেবেই নয়, স্বাধীন দেশের একজন নাগরিক হিসেবেও এ বিষয়টি আমাদের বোঝা উচিত। কারণ স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে যে সংবিধান রচিত হয়েছে তাতে রাষ্ট্রের মৌলিক চার নীতির মধ্যে 'ধর্মনিরপেক্ষতা'কে স্থান দেওয়া হয়েছে। এরপর সংবিধানের ৫ম সংশোধনীতে এ নীতিটি বাদ দিয়ে তার স্থলে আনা হয়েছে 'মহান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস'। কিন্তু তিন দশক পর আবারো বর্তমান সরকার 'ধর্মনিরপেক্ষতা' সংবিধানে ফিরিয়ে এনেছে এবং ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে "মহান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস"-এর নীতিটি।

সংবিধান জনগণকে প্রজাতন্ত্র তথা দেশের মালিক হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে। সে হিসেবে রাষ্ট্রের মালিক তথা নাগরিকদের জন্য দেশের সংবিধান জানার ও বোঝার প্রয়োজন রয়েছে। জনগণের নামে জনপ্রতিনিধি তথা সংসদসদস্যগণ কী কী বিষয় সংবিধানে যোগ-বিয়োগ করছেন তার প্রতি নজর রাখা সচেতন নাগরিকদের কর্তব্যও বটে।

উপরোক্ত দু'টি পক্ষই সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা রাখতে বদ্ধপরিকর। অথচ যে দুই যুগের বেশি সময় সংবিধানে এ জিনিসটি ছিল না তখন কি এদেশে শান্তিপূর্ণ ধর্মীয় সহাবস্থান ছিল না। ঐ সময়ের মধ্যে তো আওয়ামী লীগও ৫ বছর ক্ষমতায় ছিল। তারা কি দেশে ধর্মীয় সৌহার্দ্য বজায় রাখতে কোনো সমস্যায় পড়েছিল। দুটির উত্তরই 'না'। তাহলে 'ধর্মনিরপেক্ষতা'

সংবিধানে ফিরিয়ে আনার পিছনে নিশ্চয়ই আরো অনেক উদ্দেশ্য লুকায়িত, যা বুঝতে হলে আপনাকে দৃষ্টি দিতে হবে, মুসলমানদের খেলাফত পরবর্তী অবস্থার দিকে। চোখ ফেরাতে হবে একসময়ের তুরস্ক, ইরাক, মিসর ও সিরিয়ায়।

আদালতে ৫ম সংশোধনী বাতিল হয়েছে বলা হলেও আসলে এর অনেক কিছুই বাতিল হয়নি। এমনকি অনেক মৌলিক বিষয়ও নয়, যেমন ৫ম সংশোধনী দ্বারা ৪র্থ সংশোধনীকে বাতিল করা হয়েছিল। তৎকালীন মুজিব সরকার ৪র্থ সংশোধনীর মাধ্যমে দেশের সকল রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করে একটি রাজনৈতিক দল বানিয়েছিল। সেটা হল বাকশাল। আর সকল পত্রিকা বন্ধ করে দিয়ে সরকার নিজের মালিকানায় চারটি পত্রিকা চালু রেখেছে। রাজনৈতিক দল বা জনগণ ছাড়াও সরকারী কর্মকর্তাদেরও আবশ্যিকভাবে বাকশালে যোগ দেয়াকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। জিয়াউর রহমান ৫ম সংশোধনীতে ঐ সব বাতিল করে আবার বহুদলীয় গণতন্ত্র এনেছেন এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ফিরিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু সম্মানিত আদালত যখন ৫ম সংশোধনী বাতিল করেন তখন তিনি এ অংশটুকু বহাল রেখে দিয়েছেন।

যদি পুরো ৫ম সংশোধনী বাতিল করা হত তাহলে ৪র্থ সংশোধনী ফিরে আসত এবং দেশে পুনরায় একদলীয় বাকশালি শাসন চালু হত। মানুষ হরতাল, অবরোধ থেকে রেহাই পেত আর বর্তমান সরকারী দল অনন্তকাল ক্ষমতায় থাকার সুযোগ পেয়ে দ্রুত দেশকে উন্নত করে ফেলতে পারত। নির্বাচন কমিশনকে বদনাম হতে হত না বিরোধী দলবিহীন ৫ জানুয়ারির নির্বাচন করে। যাহোক, ঐ সংশোধনী বাতিলের অন্যতম উদ্দেশ্যই হয়তো ছিল 'আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসে'র স্থলে ধর্মনিরপেক্ষতাকে বসানো।

প্রসঙ্গের টানে আরেকটি কথা বলি, ১৫ তম সংশোধনীর মাধ্যমে বাহাত্তর সালের সংবিধানে ফেরত যাওয়ায় রাষ্ট্রের মৌলিক নীতিগুলোর মধ্যে 'সমাজতন্ত্র'ও ফিরে এসেছে। কিন্তু সকলেই জানে যে, বাংলাদেশ এখন সম্পূর্ণ পুঁজিবাদী একটি রাষ্ট্র। বাহাত্তর সালে সংবিধানে যখন সমাজতন্ত্র ছিল তখন তো বিশ্বের বড় বড় দুটি রাষ্ট্রে সমাজতন্ত্র চালু ছিল, এখন সেগুলো ধনতন্ত্রের স্বর্গরাজ্য। অথচ আমরা এখন ফিরিয়ে এনেছি 'সমাজতন্ত্র'। কিন্তু চলছি পুঁজিবাদী নীতিতে। এটা নিয়ে কোন বিশ্লেষণ নেই, ঝগড়া-ঝাটিও নেই। এত মোক্ষম সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সমাজতন্ত্রীরা কেন এই দাবি উঠায় না। এর চেয়ে বড় মোক্ষম সুযোগ আর কোথায়? আসলে না আদালতের এ নিয়ে কোন মাথাব্যাথা আছে, না তাদের। তারা বরং ধর্মনিরপেক্ষতা পেয়েই আপাতত অন্য বিষয়ে ছাড় দিতে প্রস্তুত। আসল বিষয় হল সেক্যুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতা। সংবিধানের শুরুতে আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস বড়ই বেমানান। আর ধর্মনিরপেক্ষতাটা রাখা অনেক কিছুর জন্যই প্রয়োজনীয়। এ প্রয়োজনেই সংবিধানের সংশোধনী এসেছে।

'আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' নীতিকে ছুঁড়ে ফেলে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' প্রতিস্থাপন। না হয় আদালত যখন বাছাই করে করেই বাতিল করলেন ও রাখলেন তখন তিনি এ অংশটুকুও তো রেখে দিতে পারতেন।

ওটা বসালে লাভ কী?

কেউ কেউ বলে, মহান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস সংবিধানে থেকেই বা লাভ কী? সংবিধানে তো ইসলাম বিরোধী অনেক কিছুই আছে। দেশে তো আর ইসলামী হুকুমত নেই, কখনো ছিলও না। তাহলে অতটুকু কথা বাদ দিলেই বা কী এসে যায়? আপনি কেন এর বিরোধিতা করছেন? আমি বলি, ঠিক যে কারণে ওরা সংবিধান থেকে বিষয়টি তুলে দিতে চায়। মহান আল্লাহ তাআলার উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস যদি কোনো কাজেই না আসত তাহলে কেন তারা এটি সরিয়ে দিতে চায়? ওটা সরিয়ে দেওয়ার কারণে কি কোনো বদনাম হতে হচ্ছে না। তারপরও তারা এ ঝুঁকি নিল কেন?। কিছু কথা আছে খুব সহজেই বুঝে আসে। অনেক দূরে গিয়ে বোঝার দরকার হয় না। সরকার কেন ওটাতে হাত দিচ্ছে? এতেই বুঝা যায় যে, এতটুকু বাক্য সংবিধানে থাকারও কিছু মূল্য আছে।

২০০৬-২০০৮ তত্ত্বাবধায়ক সময়ের একটি ইসলামী দল ও একটি ধর্মনিরপেক্ষ দলের জোটবদ্ধ হওয়া এবং ঐ ইসলামী দলটি কর্তৃক ধর্মনিরপেক্ষতার গলদ ব্যাখ্যা দেওয়ার পরই মনে হয়েছিল যে, সেক্যুলারিজম সম্পর্কে মাদরাসাগুলোতে পড়াশোনা থাকা দরকার এবং এ বিষয়ে আমাদের আরো সচেতন হওয়া উচিত।

বাংলাদেশে সেক্যুলারিজম বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতা:

আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হয়েছিল **১৯৭২** সালে। সদ্য স্বাধীন হওয়া রাষ্ট্রের নতুন সংবিধানের মূলনীতিতে 'ধর্মনিরপেক্ষতা'কে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়।

জনগণ তখন জেনেছে এই রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষতার জন্য স্বাধীন হয়েছে। বিজয়ের এক বছর পর **১৯৭২** সালের শেষের দিকে সংবিধান প্রণয়ন সমাপ্ত হয়েছে। বস্তুত তখনই দেশের সাধারণ জনগণ এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুক্তিযোদ্ধারা জেনেছে যে, ধর্মনিরপেক্ষতার জন্য এ দেশ স্বাধীন হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধাদের ধর্মীয় পরিচয় যাই হোক, অল্প ধার্মিক হোক বা বেশি ধার্মিক যুদ্ধের সময় তারা জানেনি যে, তারা সেকুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতার জন্য যুদ্ধ

করছেন। এটা জেনেছেন তারা ১৯৭২ এর শেষে স্বাধীনতা যুদ্ধেরও আরো এক বছর পরে। কারণ সংবিধানে এই কথা লিখে দেওয়া হয়েছে যে, যে সব কারণে আমাদের দেশের আবাল, বৃদ্ধ, নওজোয়ানরা মুক্তিসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন তার অন্যতম উদ্দেশ্য ধর্মনিরপেক্ষতা। এটা সংবিধানে লেখা আছে।

এর আগ পর্যন্ত কেউ বলতে পারবে না যে, আমাদের দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রাম ধর্মনিরপেক্ষতার জন্য হয়েছে। কোনো ঐতিহাসিক দলিলে সেটা নেই। আপনি আমাদের দেশের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বইগুলো, পৌরনীতির বইগুলো পড়লে এর যথার্থতা খুঁজে পাবেন। এছাড়া স্বাধীনতার পূর্বে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানী জনগণ বহু আন্দোলন করেছে। শেখ মুজিবের নেতৃত্বে অনেক আন্দোলন হয়েছে। ঐতিহাসিক ৬ দফা পেশ হয়েছে। ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান হয়েছে। ৭০-এর ঐতিহাসিক নির্বাচন হয়েছে। এগুলোর কোথাও ধর্মনিরপেক্ষতার নাম-গন্ধও ছিল না। এমনকি আপনি বর্তমান সময়ের (যখন দীর্ঘদিন থেকে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায়) মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট দেখুন। সেখানেও মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা পাবেন না। সুতরাং অত্যন্ত দৃঢ়তা ও আস্থার সাথে বলা যায় যে, সংবিধানের প্রস্তাবনায় লিখিত নিম্নলিখিত বাক্যটি বাস্তবসম্মত নয়।

"আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে
প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল... ধর্মনিরপেক্ষতার সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে।"

সম্ভবত এ কারণেই স্বাধীনতার ঘোষণাকারী মতান্তরে ঘোষণা পাঠকারী জেডফোর্সের কমান্ডার মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান প্রথম সুযোগেই এটিকে ছুঁড়ে ফেলেছিলেন এবং পরবর্তীতে অনেক সেক্টর কমান্ডারকেই জনগণ ধার্মিকরূপে পেয়েছে।

সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতার বিদায়

শেখ মুজিব সরকারের সময়েই সংবিধানে ৪টা সংশোধনী হয়ে গিয়েছিল। এরপর জিয়াউর রহমান ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশের আইন থেকে ধর্মনিরপেক্ষতাকে সরিয়ে দেন এবং তার স্থলে 'মহান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' বাক্য স্থাপন করেন। দুই যুগেরও বেশি সময় পর্যন্ত সংবিধানে এ বাক্যটি ছিল। এমনকি ১৯৯৬-২০০১ সময়ের আওয়ামী লীগ আমলেও।

'আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' বাদ গেল, 'ধর্মনিরপেক্ষতা' আবার এল।

এরপর হঠাৎ একদিন দেশের ধর্মপ্রাণ নাগরিকগণ অবাক বিস্ময়ে শুনলেন যে, তাদের সংবিধান থেকে 'আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' বাদ দিয়ে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' পুনঃস্থাপিত হয়েছে এবং এ কাজটি করেছেন দেশের উচ্চ আদালত। যদিও আদালতের রায় প্রকাশ করতে গিয়ে মিডিয়াগুলো বলেছে, ৫ম সংশোধনী বাতিল করা হয়েছে। আসলে বিষয়টি তেমন নয়। বরং ৫ম সংশোধনীর অনেক কিছুই আদালত বহাল রেখেছেন। বাছাই করে করে কিছু জিনিস বাতিল করেছে আর কিছু জিনিস আগের মতোই রেখে দিয়েছে। লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, বিচারপতি খায়রুল হক সাহেবের আদালত এ কাজটি করেছে স্বউদ্যোগী হয়ে। তার কাছে কেউ এ ব্যাপারে আবেদন বা মামলা করেনি। বরং একটি সিনেমা হলের মালিকানা সংক্রান্ত মামলার রায় দিতে গিয়ে তিনি কাজটি করেছেন। মহান আল্লাহ তাআলার উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসকে সরিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতা ফিরিয়ে এনেছেন।

সর্বোচ্চ আদালতের রায়ের পরপরই বর্তমান সরকার সে অনুযায়ী সংবিধান মুদ্রণ করে এবং এরপর ১৫তম সংশোধনী এনে ধর্মনিরপেক্ষতাকে পুনরায় স্থান করে দেয়। এভাবে উৎফুল্ল হয়ে উঠে দেশের একশ্রেণীর ধর্মবিদ্বেষী শ্রেণী, ধর্মবিরোধী গণমাধ্যমগুলো। আর উপেক্ষিত হয় সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মপ্রাণ মানুষের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা। আমাদেরকে ইতিহাস জানতে হবে, মনে রাখতে হবে এবং অনুধাবন করতে হবে। কে কোন কাজটি কোন মতলবে করছে তা বুঝতে হবে।

ধর্মনিরপেক্ষতা আসলে ধর্মহীনতা নাকি ধর্মহীনতা নয়। কার কথাটা ঠিক?

আমাদের দেশে ধর্মনিরপেক্ষ লোকেরা দুই ধরনের।

১. ধর্মবিদ্বেষী ও ধর্মদ্রোহী লোকজন। অনেক কট্টর বামপন্থী এ শ্রেণীর আওতাভুক্ত।

২. আরেক শ্রেণী আছে যারা জায়গা বুঝে কথা বলে। আত্মরক্ষার জন্য যারা ভদ্র সাজে। ভদ্র বলতে যারা একটু রাখঢাক করতে চায়। এরা বলে ধর্মনিরপেক্ষতা মানেই ধর্মহীনতা নয়। এরা ধর্মনিরপেক্ষতাও রাখবে আবার ধর্ম ওয়ালাদের নারাজও করবে না। এদের উদাহরণ হল।

رحمن بھی راضی رہے اور شیطان بھی بے زار نہ ہو-

আল্লাহও রাজি থাকুক, কিন্তু শয়তানও অসন্তুষ্ট না হোক।

এরা মানুষকে বলে বেড়ায় যে, ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়; বরং এর উদ্দেশ্য হল, রাষ্ট্র কোনো বিশেষ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করবে না; ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সবার ইত্যাদি। এ লোকগুলো একদিক থেকে ধর্মনিরপেক্ষতার আসল সংজ্ঞাকে গোপন করে, অন্যদিকে নিজেদের আসল মতলবকে গোপন রেখে ধর্মপ্রাণ ও ধর্মবিরোধী উভয় গোষ্ঠীকে সন্তুষ্ট রাখতে চায়।

ধর্মনিরপেক্ষদের দেখলাম যে, তারা বিভিন্ন ধরনের কথা বলে। এটা তো এই দেশীয় বক্তব্য। অথচ সেক্যুলারিজম তো এদেশে শুরু হয়নি। এ দেশের আগেই এ নীতি প্রচার পেয়েছে। আমরা পড়া-শোনা কম করি তাই অন্যরা আমাদেরকে ধোঁকা দিতে সক্ষম হয়।

সুতরাং কালো এবং সাদার পার্থক্য বুঝতে হবে। আলো-অন্ধকারকে একাকার করা যাবে না। যদিও সেটা হয় আলোর রেখাপাতমাত্র। ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যাখ্যা মতলববাজরা যা দেওয়ার দিক, আলেম-ওলামাদেরকে থাকতে হবে সতর্ক। কিছুতেই বলা চলবে না ধর্মনিরপেক্ষতা ধর্মহীনতা নয়; বরং বিষয়টি দেখতে হবে বাস্তবতার নিরিখে, সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি দিয়ে। আমরা মনে করি যে, আমাদের এখন যে আলেমপ্রজন্ম আছে এরা গলদ বুঝ নিয়ে ওদিকে অগ্রসর না হোক। তাদেরকে ভবিষ্যতে এ বিষয়গুলোর সম্মুখীন হতে হবে আরো বেশি।

তুরস্ক এর উদাহরণ

ধর্মনিরপেক্ষতার বাতিক একটি জাতিকে কত উঁচু থেকে কত নীচুতে নিক্ষেপ করতে পারে তার নযীর আপনি দেখতে পারেন একসময়কার সালতানাতে উসমানিয়ার রাজধানী তুরস্কে।

এটি ঐ তুরস্ক, যে শাসন করেছিল হারামাইন শরীফাইনসহ পৃথিবীর একটি বিশাল অংশ। শত শত বছরের সে উসমানী খেলাফতের কেন্দ্রবিন্দুই শেষের দিকের সুলতানদের অযোগ্যতা-অদক্ষতা ও অপরিণামদর্শিতার কারণে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে। কামাল আতাতুর্ক হলেন ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের আদর্শ ব্যক্তি, যিনি এই তুরস্কেই সেক্যুলারিজমকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছিলেন। আতাতুর্ক সাহেব তুরস্কে কী কী ঘটিয়েছিলেন হয়ত অনেকেরই জানা থাকবে। বিশেষ করে যাদের ইতিহাস নিয়ে নাড়া-চাড়ার অভ্যাস রয়েছে।

খুব সহজ একটা উদাহরণ হল আযান। আযানের ভাষাও ওখানে বদল করে দেওয়া হয়েছিল। মাইকে দেওয়া তো নিষিদ্ধই ছিল। তুর্কি ভাষায় আযান দেওয়া হত। দারুল খিলাফা হওয়ার কারণে সেখানে অসংখ্য মাদরাসা ছিল। সেগুলো সব বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। মানুষ গর্তের ভিতরে থেকে থেকে কুরআন শিক্ষা চালু রেখেছিল। ওদের বর্ণমালা ঠিক আরবীর মতোই ছিল। এখনো তুর্কী ভাষায় লেখা বই-পত্র পাওয়া যায়। কিন্তু আতাতুর্ক সে বর্ণমালাকে নিষিদ্ধ করে রোমান অক্ষর চালু করেছেন। এখন সেখানে রোমান লিপি চলে। অর্থাৎ ইংরেজী অক্ষরে তুর্কী ভাষা লেখা হয়। এই ভদ্রলোক শুধু ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান তৈরি করে এবং ইসলামী শিক্ষা বন্ধ করেই ক্ষান্ত হননি; বরং সে দেশের প্রতিরক্ষা তথা আর্মি ও আদালতকে কড়া সেক্যুলার বানিয়ে গেছেন। কঠোরহস্তে সেখানে সেক্যুলারিজমের ধর্ম ও ধর্মওয়ালাদের বিরুদ্ধে একপক্ষীয় যুদ্ধ করা হয়েছে। কেননা ধর্মের পক্ষের লোকজন ছিল অস্ত্রশস্ত্রহীন। হাজার হাজার লোককে প্রহসনের বিচার করে-বিনা বিচারে মেরে ফেলা হয়েছে। এভাবে সেখানে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে সেক্যুলারিজম। আর আর্মি ও আদালতকে এত কড়া সেক্যুলার বানানো হয়েছিল যে, তারা কোনো ধার্মিক তো দূরে থাক কোনো ধর্মীয় দলকে ক্ষমতা দেওয়া তো দূরের কথা, কোনো দাড়িওয়ালা বা কোনো হিজাব পড়ুয়া মহিলার স্বামীকেও রাষ্ট্রপতি হিসেবে গ্রহণ করেনি; যদিও তাদের কর্তৃক পরিচালিত নির্বাচনেই ঐ ব্যক্তিরা জনগণের বিপুল ভোটে নির্বাচিত হয়ে এসেছে। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত দলকে নিষিদ্ধ করে দিতে কোনো দ্বিধাই করেনি ঐ শক্তিগুলো।

এসব থেকে আমাদেরকে শিক্ষা নিতে হবে, সতর্ক থাকতে হবে।

অন্যদেরকে সতর্ক করতে হবে এবং যারা মজলুম তাদের জন্য আশার বাণী হচ্ছে, তুরস্কের বর্তমান পরিস্থিতি। যেখানে ঐ অপশক্তিগুলোর হুংকার কমে আসতে শুরু করেছে। কিন্তু সেটি ঘটেছে অসংখ্য শহীদের রক্ত, মজলুমানের কান্না, অসীম ধৈর্য্য ও অক্লান্ত পরিশ্রমের পর। এ তুর্কিতেই একসময় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হত পার্লামেন্ট সদস্যদের ভোটে। পার্লামেন্ট নির্বাচনে সেক্যুলার আর্মি বড় বড় অফিসাররা পাহারাদারি করত। প্রায় বিশ-ত্রিশজন বড় বড় আর্মি

অফিসারের রাঙ্গানো চোখের সামনে দিয়ে ভোট দিতে হত। ভোটের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বসে থাকত লোকগুলো। এভাবে তারা যতদিন পেরেছে নিয়ন্ত্রণ করেছে।

প্রসঙ্গ মিসর

ঐতিহ্যবাহী দেশ মিসরের সর্বপ্রথম নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট মুরসী। রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ তাকে ভোট দিয়েছে। এর আগে মিসরের ইতিহাসে কোনো নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ছিল না। আগের সরকারগুলো রাষ্ট্রীয় ফরমান, সামরিক ফরমান জারি করে ক্ষমতায় ছিল। ড. মুহাম্মাদ মুরসী পশ্চিমা লোকদের বড় বড় আস্থাভাজন, নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বড় বড় ব্যক্তিদের মোকাবেলা করে নির্বাচিত হয়েছেন। এভাবে নির্বাচিত হওয়ার পরও অনেক চড়াই উৎরাই এবং প্রাণহানির পর ক্ষমতায় বসেছেন। কিন্তু একটি দিনের জন্যও তাঁকে শান্তিতে রাষ্ট্র চালাতে দেওয়া হয়নি। আদালত ও সামরিক বাহিনীর নগ্ন হস্তক্ষেপ এবং সেক্যুলার ও বেদ্বীন তথাকথিত সুশীলদের বহুমুখি ষড়যন্ত্র চলেছে সমান্তরালে এবং শেষ পর্যন্ত বন্দুকের জোরে ক্ষমতাচ্যুত করে অন্ধকার কারাবাসে পাঠানো হয়েছে। এসব কী? এসবই হল সেক্যুলারিজমের বদ-আছর। এভাবেই সেক্যুলার শক্তিগুলো যুগে যুগে দেশে দেশে ষড়যন্ত্র ও দমন-পীড়নের মাধ্যমে মুসলমান ও ইসলামপন্থীদের দমিয়ে দিচ্ছে। তাদের গণতন্ত্র-মানবাধিকার এক্ষেত্রে অন্য কোনো অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

আমাদের শিক্ষা কমিশন

একটা শিক্ষা কমিশন গঠন থেকে শুরু হয়ে কমিশনের রিপোর্ট হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রের কোটি কোটি টাকা ব্যয় হয়। কমিশনের সদস্য ও সহযোগীরা পৃথিবীর বহু দেশ সফর করেন। তারা ইউরোপ, আমেরিকাসহ বিভিন্ন দেশের শিক্ষানীতি স্বচক্ষে দেখে সে অনুযায়ী এদেশের শিক্ষানীতি তৈরি করেন। এভাবেই কাজ করেছিলো এ দেশের সর্বশেষ শিক্ষা কমিশন।

প্রত্যেক শিক্ষানীতিরই কতগুলো উপাদান থাকে, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকে। আমাদের শিক্ষানীতির মূল আদর্শ বানানো হয়েছে সেক্যুলারিজমকে। ধর্মনিরপেক্ষতাকে মাথায় নিয়ে শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। স্পষ্টভাবে তা উল্লেখও করা হয়েছে। অবশ্য ওটা যদি শব্দে ব্যবহার না করত তবুও তা স্পষ্ট ছিল।

প্রসঙ্গ বোরকা

কয়েক মাস আগের কথা। সংবিধানের সর্বশেষ সংশোধনী হয়ে সেক্যুলারিজম প্রতিস্থাপিত হয়েছেমাত্র। কিছু দিনের মধ্যে উচ্চ আদালত

'সুয়োমটো' (কারো আপিলের অপেক্ষা না করে স্বপ্রণোদিত রুল) জারি করলেন। বিচারক সাহেব বললেন, কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মেয়েদেরকে বোরকা পরতে বাধ্য করা যাবে না। এটা নিয়ে আমি মন্তব্য করতে চাই না। এ দেশের সংবিধান অনুযায়ী উচ্চআদালত যা বলবেন তা-ই আইন। ভালো যে, পশ্চিমা কোনো রাষ্ট্রের মতো এখানে বোরকা নিষিদ্ধ হয়ে যায়নি। তবে বিজ্ঞ বিচারক যে যুক্তি দিয়েছেন তা লক্ষণীয়। তিনি বলেছেন, যেহেতু আমাদের রাষ্ট্র হল ধর্মনিরপেক্ষ তাই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মেয়েদেরকে বোরকা পরতে বাধ্য করা যাবে না। ধর্মনিরপেক্ষতা বুঝতে কারো অসুবিধা হলে এ ধরনের দু চারটা নজির মনে রাখলেই হবে।

তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

আরব বিশ্বের কোনো কোনো ডক্টর-প্রফেসর ধর্মনিরপেক্ষতার সপক্ষে বইপত্রও লিখে ফেলেছেন। তারা নিজেদেরকে আলেমও মনে করে থাকেন এবং নিজেদের বক্তব্যের সপক্ষে কুরআন-হাদীসের দলিল দেওয়ারও চেষ্টা করেছেন। তারা বলেন যে, ইসলাম নামায, রোযা, ইবাদত-বন্দেগী কীভাবে আদায় করবে তা শিক্ষা দেয়, কিন্তু রাষ্ট্র কিভাবে পরিচালিত হবে তা ইসলাম বলেনি। সুতরাং ইসলামে রাজনীতি নেই। (এ কথাটাই আমাদের দেশের ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলো এভাবে বলে যে, ধর্ম পবিত্র জিনিস। রাজনীতি থেকে এটাকে আলাদা রাখতে হবে।) যা হোক, ঐ আরব সেক্যুলার আলেমদের বক্তব্য হচ্ছে ইসলাম ইবাদত বন্দেগীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। রাষ্ট্র পরিচালনা, বিচার প্রক্রিয়া, শিক্ষা-দীক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ধর্মকে টেনে আনার কথা ইসলামে নেই।

হাদীস দ্বারা দলিল

এরা আমাদের দেশের কারো কারো মতো 'লাকুম দ্বীনুকুম ওয়ালিয়া দ্বীন' (শুনেছি কেউ কেউ নাকি নিজেদের ভাষণে সূরা কাফিরুনের এই আয়াতকে বুখারী শরীফের হাদীস বলে থাকেন) দ্বারা দলিল পেশ না করলেও ধর্মনিরপেক্ষতার স্বপক্ষে দু' একটি হাদীসও পেশ করে থাকেন। এমনই একটি হাদীস হল, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ-

أنتم أعلم بأمور دنياكم

হাদীসের প্রেক্ষাপট হল, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট তাবীরুন নাখল (খেজুর চাষ সংক্রান্ত একটি বিশেষ পদ্ধতি) বিষয়ে পরামর্শ চাওয়া হলে তিনি তা অপছন্দনীয় বলেছেন। পরবর্তী বছরে ফলন কম হলে তখন তিনি বলেছিলেন-

إذا أمرتكم بشيء من أمر دينكم فاتبعوه

অর্থাৎ দ্বীনি বিষয়ে বললে সেটা শুনো, মানো। আর দুনিয়াবী বিষয়ে কিছু বললে মনে করবে তোমাদের এসব বিষয়ে তোমরাই ভালো জান।

এটা তাদের বড় দলিল। কেননা আল্লাহর রাসূল নিজেই বলেছেন যে, দুনিয়াবী বিষয়ে আমার কথা তোমরা শুনলেও শুনতে পার আবার নাও শুনতে পার। যদি সকল বিষয়ে তার নির্দেশনা মানা আবশ্যিক বিষয় হত তাহলে এখানেও আবশ্যিক হত।

শরীয়তের মেযাজ, খেতাব সম্পর্কে যারা অবগত তাদেরকে এসব কথার জবাব দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। তারা নিজেরাই তা সহজে বুঝতে পারে।

উপরোক্ত হাদীসটির তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় না গিয়ে শুধু তরজমা দেখেও যে কেউ বুঝে নিবেন যে, এখানে কোনো কৃষিনীতি পেশ করা হয়নি। বরং খেজুর বাগানে ফলন বৃদ্ধির একটি বিশেষ প্রক্রিয়া সম্পর্কে বলা হয়েছে, যা নিতান্তই একজন কৃষকের নিজস্ব ব্যাপার। ঠিক যেমন একজন কৃষক তার ক্ষেতে ধান চাষ করবে না গম, সাধারণ জাতের চাষ করবে না হাইব্রিড-এগুলো তার একান্ত বিষয়। যে পর্যন্ত জনস্বার্থের ক্ষতি না হবে ইসলাম তার কাজে হস্তক্ষেপ করবে না।

কৃষকের এ স্বাধীনতাকে ধর্মনিরপেক্ষতার দলিল বানানোর যৌক্তিকতা কোথায়?

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো সে প্রেক্ষিতেই বলেছেন-

أنتم أعلم بأمور دنياكم

তোমাদের দুনিয়াবি বিষয়গুলো তোমরাই ভালো জান।

তাদের এ সকল বক্তব্যের খন্ডন তখনই হয়েছে। বিজ্ঞ আলেমরা যুক্তিপূর্ণ জবাব দিয়েছেন। ইসলামের এটা বৈশিষ্ট্য। হাদীস শরীফে এসেছে-

لا تزال طائفة من أمتي منصورين على الحق

অর্থাৎ আমার উম্মতের একটা দল সর্বদা হকের উপর বিজয়ী থাকবে। তারা সব যুগেই ছিল, থাকবে।

অন্য হাদীসে আছে,

يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله

এরা যুগে যুগই ছিল। ওরা বই লিখেছে। কিন্তু প্রতিকূল পরিবেশে থেকেও আলেমরা এর কঠোর প্রতিবাদ করেছে।

কারাফীর কিতাব থেকে দলিল

তারা ইমাম কারাফীর কিতাব 'আলইহকাম' থেকেও দলিল দিয়ে থাকেন। সেক্যুলারিজমের কিছু কিছু লোক দাবি করেছেন যে, ইসলামের বড় বড় পন্ডিত, উসূল ও ফিকহবিদগণও ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলেছেন। তার নজির হিসেবে তারা ইমাম কারাফী রাহ.কেও পেশ করেছেন।

ইমাম কারাফী রাহ. তাঁর কিতাবের ২৫ নং প্রশ্নোত্তর অধ্যায়ে খুব সুন্দরভাবে বুঝিয়েছেন যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কার্যাবলির কোনো কোনোটি নবী হিসেবে করেছেন, কোনোটি দাঈ-মুবাল্লিগ হিসেবে, কোনোটা হাকেম-রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে। কোনোটা কাযী ও বিচারক হিসেবে। আবার কোনোটা বাশার বা মানুষ হিসেবেও করেছেন। এ কথাগুলো খুবই সুস্পষ্ট। কারাফী রাহ. বিভিন্ন হাদীসের উদাহরণ দিয়ে বিষয়গুলো বুঝিয়েছেন। ঐ অধ্যায়টি ভালোভাবে পড়ে নিলে হাদীসের কিতাবগুলো বোঝাও সহজ হয়ে যাবে।

কিন্তু কোনো কোনো গবেষক (!) ইমাম কারাফী রাহ.-এর এ কথাগুলোর উল্টো ব্যাখ্যা করেছেন। তারা বলেছেন, আল্লাহর রাসূল যে কাজগুলো নবী হিসেবে করেছেন সেগুলোই শুধু মুসলমানদের পালনীয় বিষয়। তিনি রাষ্ট্রনায়ক ও বিচারক হিসেবে যা করেছেন তা ইসলামের অন্তর্ভুক্ত বিষয় নয়।

অর্থাৎ তাদের দাবি হল, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাযী হিসাবে, হাকেম হিসাবে যা যা করেছেন তার কোনোটিই অনুসরণীয় নয়। (হ্যাঁ, অনুসরণীয় হতে পারে ঐ অ্যারিস্টটল ও আব্রাহাম লিংকনের মত। তাদের মতো ওনাকেও একজন দক্ষ ব্যক্তি হিসেবে ধরে নেওয়া যায়। ইনিও একজন বড় রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন।

গোড়াটা কিন্তু ঐ জায়গায়। অর্থাৎ এই মতবাদ মানলে শরীয়তের বড় একটা অংশকে অস্বীকার করে দিতে হয়। এটাকে গভীর থেকে দেখতে হবে তাহলে এর ভয়াবহতা স্পষ্ট হয়ে যাবে।

মুসলিম শাসকদের ইসলামী নীতিতে রাষ্ট্র পরিচালনার দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে। গোটা পৃথিবীর অনেক অংশই যখন সভ্যতা বিবর্জিত ছিল ইসলামই তখন সভ্যতার রাস্তা দেখিয়েছে। সত্যিকারের রাষ্ট্রব্যবস্থা যে অন্য যে কোনো নীতি থেকে হাজারো গুণ ভালো তা ইসলাম দেখিয়ে দিয়েছে। মূলত এটাই ছিল তাদের বাধা। এ কারণেই হয়তো সেক্যুলারিজমকে Anti Islam বলা হয়েছে। Anti Religion নয়। ধর্মবিরোধী নয়, আসলে ইসলাম বিরোধী। এই সত্যটাকে অনুধাবন করতে হবে। কারণ ধর্মের কথা তারাও বলে। তবে ওটা বাইবেল ছুঁয়ে শপথ করা পর্যন্তই এবং ডলারের গায়ে In God we trust লিখে দেওয়া পর্যন্তই। অবশ্য এতটুকুতেই ওরা খুশি। এর বেশি দরকারও মনে করে না। তো সেক্যুলারিজম দরকারই হয়েছে ইসলামকে ঠেকানোর জন্য। এ কারণেই Anti Islam ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সুতরাং ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়-এ কথা শুনে বিভ্রান্ত হওয়ার সুযোগ নেই। বরং ধর্মনিরপেক্ষতা পুরোটাই ধর্মহীনতা।

আর দেশের সংবিধানের প্রস্তাবনায় ও মূলনীতিতে ধর্মনিরপেক্ষতাকে স্থান দেওয়া এবং এটিকে স্বাধীনতা সংগ্রামের উদ্দেশ্য হিসেবে উল্লেখ করা বাস্তবতা বিবর্জিত হঠকারিতা ও সীমিত সংখ্যক লোকের মতকে সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ জনগণের উপর চাপিয়ে দেওয়ার নামান্তর। যারা এমনটি করছে তারা কিন্তু প্রকারান্তরে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সংকীর্ণ করছে।

[রেফারেন্স: ২০২৪ মাসিক আলকাউসার। সম্পাদক ও প্রকাশক: আবুল হাসান মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ। সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

ধর্মনিরপেক্ষতা ও তার কুফল

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَلِلَّهِ ٱلۡعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِۦ وَلِلۡمُؤۡمِنِينَ ٨ ﴾ [المنافقون :٨]

"ইয্যত একমাত্র আল্লাহর জন্য, তার রাসূলের জন্য ও মুমিনদের জন্যই"। (সূরা তাগাবুন ৮)

দ্বীন (ইসলাম) জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহ প্রদান করে। এতে প্রমাণিত এমন কোনো বিষয় নেই, যা বিজ্ঞানের প্রমাণিত বিষয়ের সাথে সাংঘর্ষিক। অতএব দ্বীনে ইসলাম পুরোটাই সত্য, পুরো দ্বীনই কল্যাণ, পুরো দ্বীনই ন্যায় ও ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত। এ থেকে আমরা বলতে পারি, পাশ্চাত্য সমাজে দ্বীনের প্রতি বিদ্বেষ ও অনীহা থেকে যে চিন্তা ও মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে, ইসলামী দেশে কখনো তা প্রকাশ পেত না, বরং মুসলিম দেশের কেউ তা শ্রবণও করত না, যদি না থাকত সংঘবদ্ধ স্নায়ুযুদ্ধ, যা ইসলামের নিষ্ক্রিয় ও নিষ্প্রভ হালতে ঈমান-শূন্য কতক অন্তর ও সুস্থ চিন্তা-শূন্য কিছু বিবেককে শিকার করতে সক্ষম হয়েছে।

ইসলামে নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত কোনো বিষয় যে প্রত্যাখ্যান করল, সে কাফের ও পথভ্রষ্ট, যদিও তার প্রত্যাখ্যান করা বিষয়ের পরিমাণ খুবকম ও সামান্য হয়। অতএব পার্থিব রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত ইসলামের সকল বিধান যে প্রত্যাখ্যান করে, সে কাফের বলার অপেক্ষা রাখে না, যেমন সেকুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতার অনুসারীরা।

ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের অনুসারীদের মাঝে ইসলাম বিনষ্টকারী কারণও রয়েছে, যেমন তারা বিশ্বাস করে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ থেকে অন্য কারও আদর্শ উত্তম, অনুরূপ তার ফয়সালা থেকে অন্য কারও বিচার-ফয়সালা উত্তম। এ কারণেও তারা কাফের। ইসলামী বিশ্বে ধর্মনিরপেক্ষতা বিস্তারের ফলে মুসলিমদের দ্বীন ও দুনিয়া ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এখানে আমরা তার কিছু কুফল বর্ণনা করছি:

১. সেকুলারিজম বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতা বিস্তারের ফলে রাষ্ট্রীয় জীবনে আল্লাহর বিধানকে নিষিদ্ধ করা, জীবনের সকল শাখা থেকে শরীয়তকে বিতাড়িত করা এবং নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিলকৃত ওহীর পরিবর্তে আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণাকারী কাফেরদের তৈরি বিধানকে প্রাধান্য দেওয়ার প্রবণতা দেখা দিয়েছে। আল্লাহর বিধানকে মানা ও মানব-রচিত বিধান প্রত্যাখ্যান করার আহ্বানকে তারা প্রগতির অন্তরায়, পশ্চাৎগামী ও রক্ষণশীলতা জ্ঞান করে। আল্লাহর দিকে দা'ঈ বা আহ্বানকারীদেরকে

তারা নানাভাবে হেয় ও উপহাস করে, সরকারি চাকুরী ও ক্ষমতা থেকে দূরে রাখে, যেন তারা জাতি ও যুবকদের মাঝে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম না হয়।

২. সেকুলার বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারীদের কাজই হচ্ছে ইসলামী ইতিহাসকে বিকৃত করা, তাতে মিথ্যার অনুপ্রবেশ ঘটানো ও দিগ্বিজয়ী ইসলামী আন্দোলনের ফসল স্বর্ণযুগকে ব্যক্তি স্বার্থ ও জঙ্গীবাদ বা জংগলীপনার ফলাফল বলে গালমন্দ করা এবং সমাজে এ জাতীয় ধ্যান-ধারণা তৈরি করা।

৩. সেকুলার বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার সেবাদাসরা শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে তাদের সেকুলার মতাদর্শের সেবক বানানোর কাজে লিপ্ত। এ কাজ তারা বিভিন্নভাবে সম্পন্ন করে, যেমন:

ক. শিক্ষা উপকরণ ও সিলেবাস দ্বারা ছাত্রদের মাঝে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে সেকুলার বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ প্রচার করা।

খ. ধর্মীয় শিক্ষার নির্ধারিত সময় সর্বনিম্ন পর্যায়ে নিয়ে আসা ও সংকুচিত করা।

গ. নির্দিষ্ট কতক ধর্মীয় বিষয় পাঠদানের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা, যে বিষয়গুলো সেকুলারিজম বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের শিকড় উপড়ে ফেলতে পারে কিংবা সে মতবাদের ভ্রষ্টতার স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে।

ঘ. শরীয়ত তথা কুরআন ও সুন্নাহর বিভিন্ন ভাষ্যের ব্যাপারে বিভ্রান্তি ও অপব্যাখ্যা ছড়িয়ে বিকৃতি ঘটানো, যেন মানুষ বুঝে শরীয়ত সেকুলারিজম বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাকে সমর্থন করে, অথবা ন্যূনতম পক্ষে বুঝে যে, ইসলামের সাথে তার সংঘর্ষ নেই।

ঙ. পূর্ণাঙ্গভাবে দ্বীন পালনকারী শিক্ষকদেরকে পাঠদান ও শিক্ষাঙ্গন থেকে দূরে রাখা এবং ছাত্রদেরকে তাদের সাথে মিশতে না দেওয়া। এ কাজ তারা বিভিন্নভাবে সম্পন্ন করে, যেমন দাফতরিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কাজে তাদেরকে ব্যস্ত রাখা, অথবা অর্থ উপার্জনের অন্য কোনো পথে তাদেরকে মগ্ন করে দেওয়া।

চ. ধর্মীয় বিষয়কে গুরুত্বহীন ও অতিরিক্ত বিষয়ের মান দেওয়া, যেমন শেষ পিরিয়ডে রাখা, যখন ছাত্রদের মাঝে ক্লান্তির ভাব সৃষ্টি হয়, যেন তারা ধর্মীয় শিক্ষায় উজ্জীবিত না হয়। আবার

এমনভাবে এ বিষয়কে শিক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করা যে এর সাথে ছাত্রদের পাশ-ফেলের সম্ভাবনা না থাকা।

৪. সেকুলার বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের অন্যতম কাজ হচ্ছে, সত্য দ্বীনের অনুসারী ও মিথ্যা-বিকৃত দ্বীনের অনুসারী যেমন মুসলিম-ইয়াহূদী-খৃস্টান ও নাস্তিকদের থেকে পার্থক্য তুলে দেয়া, অতঃপর সবাইকে এক মানদণ্ডে রাখা ও বাহ্যিকভাবে সবাইকে সমান মর্যাদা দেয়া, যদিও সত্যিকার অর্থে তারা কাফের, নাস্তিক, পাপাচারী ও অপরাধীদেরকে তাওহীদের ধারক-বাহক, আল্লাহর আনুগত্যকারী ও ইমানদার লোকদের উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে।

এ মতবাদের সামনে মুসলিম, খৃস্টান, ইয়াহূদী, ব্রাহ্মণ, মূর্তিপূজক সবাই সমান, তাদের সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব তখনই তাদের কাছে মুখ্য হবে যখন কেউ তাদের মতবাদের আহ্বানে সাড়া দিবে।

এ মতবাদের ধ্বজাধারীদের দৃষ্টিতে খৃস্টান, ইয়াহূদী, বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ বা সমাজতন্ত্রীর সাথে মুসলিম নারীর বিয়ে বৈধ, কোনো সমস্যা নেই, অনুরূপ তার দৃষ্টিতে মুসলিম দেশে ইয়াহূদী অথবা খৃস্টান অথবা অন্য কোনো কুফরি ধর্মের অনুসারীর শাসক হতে সমস্যা নেই।

তারা জাতীয় ঐক্য বা জাতীয়তাবাদের আড়ালে মুসলিম দেশের কর্তৃত্ব কাফেরদের হাতে তুলে দিতে চায়।

বরং জাতীয় ঐক্য বা জাতীয়তাবাদ ও দেশের অখণ্ডতাকে মূলনীতি ও একমাত্র ঐক্যের বন্ধন হিসেবে দেখে। কুরআনুল কারীমের যে অংশ অথবা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে হাদিস তাদের এ তথাকথিত জাতীয় ঐক্য বা জাতীয়তাবাদ নীতি বিরুদ্ধ হয়, তাকেই তারা ছুড়ে ফেলে ও প্রত্যাখ্যান করে। আর বলে: এটা দেশীয় একতা ও ঐক্য বিনষ্টকারী!

৫. এ মতবাদের অন্যতম একটি লক্ষ্য হচ্ছে, বেহায়াপনা ও অশ্লীলতার প্রসার করা এবং পারিবারিক সিস্টেম ধ্বংস করা। এ জন্য তারা বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে, যেমন:

ক. অশ্লীলতাকে বৈধতা দেওয়া ও তার জন্য কাউকে শাস্তি প্রদান করা যাবে না মর্মে আইন প্রণয়ন করা; যার দৃষ্টিতে ব্যভিচার ও সমকামিতা ব্যক্তি স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত, যে ব্যক্তি স্বাধীনতা! প্রত্যেকের জন্য নিশ্চিত করা জরুরি।

খ. শালীনতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণাকারী ও সেগুলোর সহায়তায় নিয়োজিত পত্রিকা, ম্যাগাজিন ও রেডিও-টেলিভিশনের অনুমোদন দেওয়া ও তাতে অংশ গ্রহণ করা। কখনো পরোক্ষভাবে আবার কখনো প্রত্যক্ষভাবে সেসব অশ্লীলতা প্রচারে রত থাকা।

গ. স্কুল-ভার্সিটি, সামাজিক সংগঠন ও সংস্থাসমূহে পর্দা নিষিদ্ধ করা এবং অবাধ মেলামেশা ও অশ্লীলতাকে চাপিয়ে দেওয়া।

৬. বিভিন্নভাবে ইসলামী দাওয়াত বাধাগ্রস্ত করা, যেমন:

ক. ইসলামী বই-পুস্তক প্রকাশ ও প্রচারণায় বিধি-নিষেধ আরোপ করা, পক্ষান্তরে যেসব বই-পুস্তকের কারণে অশ্লীলতা বিস্তার লাভ করবে, ইসলামী ঈমান-আকিদা বিনষ্ট হবে ও শরীয়তের ব্যাপারে সন্দেহ তৈরি হবে, সেগুলো অধিকহারে প্রকাশ ও বিতরণ করা।

খ. সেকুলার বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ মতাবলম্বী লোকদের বিভিন্ন মিডিয়ায় সুযোগ দেওয়া, যেন তারা দেশের অধিকাংশ মানুষের সামনে তাদের পথভ্রষ্টতা প্রচার করার সুযোগ পায় ও শরীয়তকে বিকৃত করতে সক্ষম হয়; পক্ষান্তরে যেসব আলেম মানুষের সামনে দ্বীনের হাকিকত তুলে ধরবেন তাদেরকে মিডিয়ায় নিষিদ্ধ করা হয়, অথবা ইসলামিক মিডিয়াগুলো বন্ধ করা হয়।

৭. সেকুলার বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষবাদীদের অন্যতম কাজ হচ্ছে, আল্লাহর পথে আহ্বানকারী দা'ঈদের হয়রানী করে বেড়ানো, তাদের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করা, তাদের উপর বিভিন্ন অপবাদ আরোপ করা এবং তাদেরকে বিভিন্ন খারাপ বিশেষণে বিশেষায়িত করা; সমাজে প্রচার করা যে, তারা রক্ষণশীল, বিবেক প্রতিবন্ধী ও পশ্চাতমুখী; আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে বৈরিতা পোষণকারী, চরমপন্থি ও উগ্রবাদী, বাস্তবতা বুঝে না, তারা মূল বস্তু ত্যাগ করে খোসা ধরে রাখে ইত্যাদি।

৮. এ মতবাদের অনুসারীদের অন্যতম কাজ হচ্ছে, যেসব মুসলিম সেকুলারিজম বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার সাথে আপোষ করে না তাদেরকে নিঃশেষ করে দেওয়া, তাদেরকে দেশান্তর করে দেওয়া, অথবা জেলে দেওয়া অথবা হত্যা করা।

৯. এ মতবাদের অনুসারীদের অন্যতম কাজ হচ্ছে, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের আবশ্যকতা অস্বীকার করা, জিহাদ নিষিদ্ধ করা এবং জিহাদকে একপ্রকার ডাকাতি ও বর্বরতা জ্ঞান করা। কারণ, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের অর্থ আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার জন্য যুদ্ধ করা, যেন

পৃথিবীর বুকে ইসলামী হুকুমত ব্যতীত দাপুটে ও শক্তিধর কোনো হুকুমত না থাকে; পক্ষান্তরে সেকুলার বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ হচ্ছে দুনিয়ার সকল শাখা থেকে ইসলামকে বিতাড়িত করা। ধর্ম সম্পর্কে তাদের সবচেয়ে সুন্দর উক্তি হচ্ছে: "মানুষ ও তার উপাস্যের মাঝে ধর্ম বিশেষ এক বন্ধন, যার প্রভাব ইবাদতগৃহের বাইরে ব্যক্তির কথা, কাজ ও চরিত্রে প্রতিফলিত হবে না"। অতএব আল্লাহর কালেমাকে সমুন্নত করার জন্যে জিহাদের অনুমতি তাদের দৃষ্টিতে না-থাকাই স্বাভাবিক।

ধর্মনিরপেক্ষ ও তার অনুসারীদের নিকট সম্পদ ও ভূ-খণ্ড রক্ষা ব্যতীত যুদ্ধ করা বৈধ নয়; দ্বীনের সুরক্ষা, দ্বীন প্রচার ও তার বিজয়ের জন্য জিহাদ করা তাদের নিকট বর্বরতা ও সীমালঙ্ঘনের শামিল, যা সভ্য প্রগতিশীল মানুষের নিকট গ্রাহ্য নয়!!

১০. তারা জাতীয়তা ও দেশাত্মবোধের দাওয়াত দেয়, তার ভিত্তিতে তারা মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার স্বপ্ন দেখে। তাদের নিকট একতার মানদণ্ড হচ্ছে জাতীয়তাবাদ, অথবা ভাষা, অথবা ভূ-খণ্ড অথবা পার্থিব কোনো স্বার্থ; ধর্মের ভিত্তিতে একতাবদ্ধ হওয়া তাদের সংবিধানে বৈধ নয়, বরং দ্বীন তাদের দৃষ্টিতে অনৈক্য ও বিভেদ সৃষ্টির বড় কারণ। তাদের কেউ এমনও বলেছে: "রক্তাক্ত শতাব্দীগুলোর অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে, পরকালীন জীবনের নিরাপত্তার জিম্মাদার কথিত ধর্ম বা দ্বীন শান্তিকে ধ্বংস করেছে"।

আমরা এখানে সেক্যুলার বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের অনুসারীদের জন্ম দেওয়া মুসলিম দেশে বিদ্যমান কয়েকটি কুফল উল্লেখ করলাম, বস্তুত তার কুফল আরো অধিক, আরো ব্যাপক।

কেউ দৃষ্টি দিলে এ সকল কুফল অথবা তার বেশিরভাগ কুফল অধিকাংশ মুসলিম দেশে অনুভব করবে বা স্বচক্ষে দেখবে। আরো দেখবে যে, মুসলিম দেশের গভীর পর্যন্ত এ সেকুলার বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতা স্বীয় শিকড় শক্তিশালী করেছে।

একজন মুসলিম তার ডানে-বামে মুসলিম অধ্যুষিত যে কোনো দেশের দিকে তাকালে খুব সহজে, বিনা কষ্টে ও অনায়াসে সেক্যুলারিজম বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার এক বা একাধিক কুফল দেখতে পাবে, বরং তার বিবিধ কুফল থেকে মুক্ত কোনো দেশ খুঁজে পাওয়া মুশকিল।

নারীদের সেক্যুলারিতা

নারীবাদ, নারীদের সেক্যুলারিতাকে স্পষ্ট করে। টেস্টোস্টেরোন হরমোন-জাত বৈশিষ্ট্য হলো 'প্রভাব-প্রতিপত্তি' বা ডমিনেন্স। পুরুষ সৃষ্টিগতভাবে 'আমির ম্যাটেরিয়াল'। আর নারী 'মামুর' ম্যাটেরিয়াল, আনুগত্য ও সহজে প্রভাবিত হবার বৈশিষ্ট্য নারীর মাঝে প্রবল। পুরুষেরা নষ্ট হয়েছে, স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে আমাদের নারীরা নষ্ট হয়েছে। একে আলাদাভাবে 'নারীদের স্পর্ধা' হিসেবে বলা যায় না।

পুরুষেরা একেকজন পাক্কা দাইয়ুস হয়েছে, আত্মমর্যাদা ইউরোপের হাটে তুলে গায়রতহীন লো-টেস্টোস্টেরোন কাপুরুষ হয়েছে।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: দাইয়ুস কোনোদিনও জান্নাতে প্রবেশ করবে না।সে যদিও জান্নাতের ঘ্রাণ পাওয়া যায় সর্বনিম্ন ৪০ বছর সর্বোচ্চ ৫০০ বছরের দূরত্ব থেকে।

দাইয়ুস? দাইয়ুস হলো ওই পুরুষ, যার ঘরের নারীরা খুল্লামখোলা বেপর্দা ঘোরে, আর সে তা স্বাভাবিকভাবে নেয়। মেয়েকে হাত ধরে নাচের ক্লাসে নেয়। হাজারো মানুষের চোখের সামনে সোমত্ত মেয়েটা বাঁকা দেহে নাচে, আর গর্বে বাবার বুক ভরে ওঠে। মেয়েকে এমন পোশাক বাবা কিনে দেয়। নাই একই পোশাক পরে অন্য মেয়ে হেঁটে গেলে সেই বাবাই চোখ দিয়ে লাল মেরায়। স্ত্রী পরপুরুষের সাথে খিলখিলিয়ে হেসে গড়িয়ে পড়ে, স্বামীও সেই উপভোগ করে। বন্ধুরা বৌয়ের পাশ ঘেঁষে ছবি তোলে, স্বামীই তুলে দেয়। বন্ধুরা বলে, 'ভাবী যা সুন্দরী, দোস্ত তুই তো জিতছিস', শুনে স্বামী ভাবে সে কতই না ভাগ্যবান! রাস্তার লোকে বউকে দেখে হাঁ করে চেয়ে থাকে, স্ট্যান করে আপাদমস্তক, মনে মনে মনকলা খায়; পুরুষরা দেখে , দেখে তার খুব সুখ হয়।সে পেয়েছি, অন্যরা পায়নি । উঁহু... হবে না ভাই, ৫০০ বছর দূর থেকেই বিদায়, টা টা। লক্ষ লক্ষ দাইয়ুসের ঘরের লক্ষ লক্ষ নারী ব্যতিক্রম হবে কীভাবে ? ছেলেদের আইকন যেমন আত্মপরিচয়হীন কামাল পাশা। আমাদের মেয়েদের আইকন তেমনি বেগম রোকেয়া-রা।

[১] আম্মার ইবনু ইয়াসির রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- 'তিন প্রকারের লোক কোনোদিন জান্নাতে প্রবেশ করবে না। যথা: দাইয়ুস, পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী নারী এবং মাদকাসক্ত ব্যক্তি।'

[শুআবুল ইমান, বাইহাকি ১০৩১০; মারিফাতুস সাহাবা, আবু নুআইম: ৫২০৮, ৫২০৯; মুসনাদু আবি দাউদ তায়ালিসি: ৬৭৭; আত-তাওহিদ, ইবনু খুযাইমা: খণ্ড: ২, পৃ : ৮৬৫; সহিহুল জামি: ৩০৬২। হাদিসটি সহিহ।]

ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

'তিন ব্যক্তির জন্য আল্লাহ তাআলা জান্নাতকে হারাম (নিষিদ্ধ) করেছেন-মদে আসক্ত ব্যক্তি, পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান এবং দাইয়ুস, যে তার পরিবারে নোংরামি সমর্থন করে।'

[মুসনাদু আহমাদ: ৫৩৭২, ৬১১৩, ৬১৮০; মুসতাদরাকুল হাকিম: ২৪৪; মুসনাদুল বাযযার ৬০৫০, ৬০৫১; শুআবুল ইমান]

ইউরোপ যেমন ধর্মকে শত্রু হিসেবে দেখে, আমাদের মেয়েরাও ধর্মকে শত্রু হিসেবে দেখতে শিখেছে। ইসলাম সম্পর্কে, ইসলাম যে জীবন তাদের দিয়েছে তা সম্পর্কে আমাদের মেয়েদের জানাশোনা ভয়ংকর রকম কম। ভার্সিটিতে যান, সেখানে ১০০ জন মেয়ের সাথে যদি আপনি ১০ মিনিট করে কথা বলেন ইসলামে নারীর অবস্থানের ব্যাপারে, ৯৫ জনের মাঝে কোনো-না-কোনো পয়েন্টে বিভিন্ন মাত্রার ইরতিদাদ (ইসলাম ত্যাগ) দেখতে পাবেন। দেখবেন কোনো একটা টপিকে হয় কুরআনের কোনো আয়াতকে, না হয় স্পষ্ট কোনো হাদিসকে সে হয় অস্বীকার করছে, না হয় এ যুগে অচল বলে মন্তব্য করছে। ইসলামকে পুরুষতান্ত্রিক ও সেকেলে, আর পশ্চিমা সভ্যতাকে আধুনিক ও নারীবান্ধব বলে মনে করছে। খুব স্বাভাবিক। সে ঘরে তার মায়ের নিগৃহীত জীবন আর টিভিতে পশ্চিমের বাঁধনহারা জীবন দেখতে দেখতে বড়ো হয়েছে। তুলনা করেছে। দুটোর জন্য দায়ী তো পুরুষরাই।তারা নিজ ঘরের মেয়েদের মোদ্দা কথা হলো ইসলাম যে মর্যাদার, প্রশান্তির, আরামের আর সার্থকতার জীবন নারীকে দিয়েছিল, আমাদের 'হিন্দুয়ানি মুসলিম' সমাজ তা আমাদের নারীদের দিতে পারেনি, মানে দেয়নি আর কি। পশ্চিমা সমাজ কিন্তু নারীবাদের ঝলমলে সোনালি খাঁচা ঠিকই তাদের কাছে পৌছে দিয়েছে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে। আমরা আমাদের নিজ ঘরের মেয়েদের কাছে ইসলামের মুক্তির ডাক পৌঁছাতে পারিনি।

পুরুষের সাথে প্রতিযোগিতায় মেয়েরা এখন ছুটে চলছে। আমরাই কি বছরের পর বছর ঘরের কাজে দিনরাত খাটতে থাকা নারীদের তাচ্ছিল্য করিনি? 'ঘরেই তো থাকো সারাদিন', 'কিছুই তো করে না', 'আমার স্ত্রী কিছু করে না, হাউজওয়াইফ।' ঘরের কাজ কোনো কাজই না, এই মাইন্ডসেটের জন্য দায়ী তো আমরাই, নাকি? ইউরোপের খ্রিস্টান পুরুষ যা করেছে, আমরা

আমাদের মেয়েদের সাথে ঠিক তাই করেছি। তাদের নারীরাও ধর্মকে ঝেড়ে ফেলেছে, আমাদের নারীরাও একই রাস্তায় বাঁচার উপায় খুঁজছে।

পৃথিবীর ইতিহাসে কখনো এমন দিন আসেনি, আমাদের মেয়েরা আমাদেরকেই শত্রু ভেবেছে। পরিবারকে, পরিবার গঠনকে নিজের পিছুটান মনে করছে। নিজের সম্মানিত পিতা, খেলার সাথি বড়ভাই, প্রাণের স্বামী, কলিজার ছেলেকে মেয়েরা শত্রু ভাবছে: এরা তাকে আটকে রেখেছে, তাকে মুক্ত-স্বাধীন হতে দিচ্ছে না, তার 'নারী হয়ে ওঠা'র পেছনে জীবনকে নিজের মতো উপভোগ করার পেছনে এরাই বাধা। বাঁধ ভেঙে দাও... ন ডরাই...। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন দিন কখনো আসেনি যে মেয়েরা গর্ভধারণকে তুচ্ছজ্ঞান করেছে। আহা, যে গর্ভধারণকে নারী নিজ নারীজন্মের পূর্ণতা ভাবত, তাকে ফেলে দেবার অধিকার চাইছে। পশ্চিমে গবেষণা হচ্ছে Risk of Pregnancy নিয়ে, যেন এটা একটা রোগ। সারা দুনিয়ার জনসংখ্যার হার কমে যাচ্ছে নারীবাদের কারণে, ইউরোপ-আমেরিকায় আরো বেশি কমে যাচ্ছে। পুরস্কার ঘোষণা করেও বিয়ে করানো যাচ্ছে না।

হাজারো মানুষের হাজারো মনমানস থেকে সুরক্ষার সকল স্তর নারী ত্যাগ করেছে। ইসলাম যে কয়েক স্তর বিশিষ্ট প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নারীর জন্য দিয়েছিল, সেগুলোকে উঠিয়ে দিয়ে নারীকে ভিকটিম হিসেবে শিকারযোগ্য করে তুলেছে নারী নিজেই। পশ্চিমা সভ্যতার বড়ি গিলে তুলে নিয়েছে সব বাঁধ। সহশিক্ষা, সহকর্ম, বিয়েপূর্ব প্রেম, পরকীয়া। যে নারীকে পাওয়া ছিল কঠিন, নারীকে পেতে হলে পুরো সমাজকে সাক্ষী রেখে, উপযুক্ত সম্মানী পরিশোধ করে, স্বামী হিসেবে তার আজীবন সকল প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব নিয়ে এরপর তাকে একান্তে পেতে হতো। এখন সে নারীকে সহজেই পাওয়া যায় চোখের আড়ালে, কোনো প্রমাণ থাকে না, নিয়ে যাওয়া যায় পার্কের চিপায়, লাইব্রেরিতে স্টাডির অসিলায়, খালি ফ্ল্যাটে, হোটেলে, অফিসে কিংবা মিডিয়ায় সুযোগ দেবার লোভ দেখিয়ে। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ধর্ষণ, ধর্ষণের পর হত্যা, বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে ভোগ, গর্ভপাত, ড্রেনে পড়ে থাকা নবজাতক, ভিডিও তুলে ছেড়ে দেওয়া।

এসব নারীবাদী সেক্যুলার ধারণা থেকে নারীরা আজ কত অধঃপতনের অতল গর্ভে হারিয়ে গেছে ।

ক্যারিয়ারে সেক্যুলার

নিজের মতামত, ভোট, মেধা, অস্ত্র, শ্রম দিয়ে আল্লাহর সাথে স্পর্ধাকারী সিস্টেমকে সমর্থন দিয়েছি মনে করেছি, বিশ্বাস করেছি 'রাজনীতিতে আল্লাহর কোনো জায়গা নেই, বাক্যকে আউড়িয়েছি, শিখিয়েছি, দম্ভভরে ঘোষণা করেছি। কত বড় সাইন আমার, আমি আল্লাহকে বের করে দেবার কথা বলেছি, আল্লাহর দেওয়া মাটির ওপর দাঁড়িয়ে, আল্লাহর খেয়ে আল্লাহর পরে। আপনারা কী ভাবতে পারছেন আমরা কী করেছি? What we have done? 'আল্লাহ' মুক্ত রাজনীতি করেছি গত ১০০ বছর। কী জানি কাকে দেখানোর জন্য, কাদের সাপোর্ট পেতে পেছনে ফেলে রেখেছি কুরআনের অকাট্য সব বিধান। যেন এসব কুরআনে নেই।

চাকরিজীবনে আল্লাহকে বের করে দিয়ে চাকরি খুঁজেছি। চাকরিতে আবার আল্লাহ কেন আসবে? জীবিকা নিয়ে আল্লাহ কী বলল, তাঁর নবি কী বলল, কোনো তোয়াক্কা করিনি। কেউ বলে দিলেও পাত্তা নেই আমার কাছে। ওসব কি এ যুগে চলে? যেন বললাম, 'মধ্যযুগীয় আল্লাহ' আর তাঁর 'মধ্যযুগীয় রাসুল'-এর কথায় এই আধুনিক যুগ চলবে? (নাউযুবিল্লাহ) এটাই তো বলতে চাই, না কি? কথা ও চিন্তার 'গতিপথ' কোনদিকে দেখেন? আমাদের কথা আর আমাদের কাজে কী পরিমাণ স্পর্ধা প্রকাশ পায়, দেখেছেন? এগুলোর মানে কী দাঁড়ায়?

সহিহ মুসলিমের হাদিসে রয়েছে, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুদগ্রহীতা, সুদদাতা, সুদের চুক্তিলেখক ও চুক্তির সাক্ষীদের ওপর লানত করেছেন।
[দামি তিরমিযি: ১২০৬; সহিহ মুসলিম: ১৫৯৮]

নবিজির অভিশাপের কী মূল্য?

বলতে শোনা যায়,আলহামদুলিল্লাহ, আজ সুদের চুক্তিলেখকের চাকরি পেয়েছি। মেয়ের জামাই কী করে? জামাই সুদের চুক্তিলেখক। মেয়ে মাইক্রোসুদ এনজিওতে চাকরি করে। একবারও তোয়াক্কা করিনি আল্লাহ কী বলেছেন এই চাকরির ব্যাপারে। এই লেখাটি পড়তে পড়তে নিজের অন্তরের দিকে তাকান। আল্লাহর যুদ্ধ ঘোষণার কোনো পাত্তা আমার কাছে আছে কি না।

দারিদ্র্যের ভয়ে সুদে ঋণ নিয়েছি, ব্যবসা করব। কে ঘুচাবে আমার দারিদ্র্য? কে বণ্টন করে রিজিক? আমি কি আল্লাহর সাথে যুদ্ধ করে রিজিক ছিনিয়ে আনতে চাচ্ছি?

আল্লাহ বলছেন কুরআনে: 'আল্লাহ সুদকে হারাম করেছেন... এরপর যা তোমরা সুদ ত্যাগ না করো, তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের পক্ষ থেকে 'যুদ্ধের' ঘোষণা শুনে নাও।' [সুরা বাকারা, আয়াত: ২৭৫-২৭৯]

হোয়াট? আমরা চাকরি-ব্যবসা করছি, নাকি আল্লাহর সাথে যুদ্ধ করছি? আমরা করতে চাচ্ছিটা কী আসলে? একটু ভাবেন, আমার পরিচয়টা কী আসলে? মুসলিম? মুসলিম মানে তো আত্মসমর্পিত, এর অর্থ তো 'প্রতিপক্ষ' নয়। আমার ক্যারিয়ার থেকে (৮ ঘন্টা দিনে) মহাশক্তিধর আমার Owner-কে আমি বের করে দেবার দুঃসাহস দেখিয়েছি। হোম লোন, কার লোন, বিয়ে লোন, শিক্ষা লোন। হে মহাশক্তিধর পরাক্রান্ত আল্লাহর 'প্রতিপক্ষ', ক্ষান্ত দেন।

নিজের ওপর রহম করেন। আল্লাহর ক্রোধকে চিনে নেন। সুরা মায়িদায় পর পর তিনটি আয়াতে আমাদের Owner, আমাদের যিনি বানিয়েছেন, সেই আল্লাহ বলছেন: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ " যা নাযিল করেছেন, তা অনুসারে যে যারা বিচারকার্য করে না... প্রথমে বলছেন, فأولئك هم الْكَافِرُون)তারাই কাফির, অবিশ্বাসী), পরের আয়াতে বলছেন, فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)তারাই জালিম, অত্যাচারী)। পরের আয়াতে বলছেন: فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (তারাই ফাসিক, গর্হিত পাপাচারী)।[১] আল্লাহর এই কথাগুলোর আর কোনো ব্যাখ্যা দরকার আছে? ২) ভার্সিটিতে সাবজেক্ট চয়েসের সময়, সার্ভিস কমিশনে পরীক্ষা

দেবার সময়, একবারের জন্যও মন বলেনি আমার Owner কী বলেছেন দেখি। এই সাবজেক্টটা নেব, না নেব না? এই চাকরিটা করব, না করব না? আমার জীবনে আমার আল্লাহর মতামতের কী মূল্য আমি দিয়েছি? বলেন, কী মূল্য আমার কাছে সর্বশক্তিমান শাস্তিদাতা এবং একইসাথে স্নেহশীল অভিভাবক Owner আল্লাহর।

আমার চাকরিই আজ আল্লাহ-বিরোধী আইন প্রয়োগের চাকরি। আমার শক্তি-মেধা- শ্রম-অস্ত্র দিয়ে আমি আল্লাহ-বিরোধী আইনকে টিকিয়ে রেখেছি। উঁচু থেকে উঁচু পদে উন্নীত হয়েছি। হে মুসলিম , আমরা কি মুসলিম আছি? নাকি আল্লাহর প্রতিপক্ষ হয়ে গেছি? এর পরের প্রোমোশন তো 'কাফিরুন-জলিমুন-ফাসিকুন' (কাফির-জালিম-ফাসিক)। আল্লাহ বলছেন-এখনো কি ঈমানদারের সময় আসেনি অন্তর বিগলিত হবার? নিজেই বিচার করেন, এই লেখা পড়ার পর আপনার অন্তর বিগলিত, নাকি উদ্ধত? এগুলো কুরআন থেকে বলা হয়েছে। অপব্যাখ্যার সুযোগ এখানে নেই।

পারিবারিক সেক্যুলারিতা

কাকডাকা ভোরে আমরা আমাদের সন্তানদের কোচিং ব্যাচের জন্য ঘুম থেকে তুলে দিই, কিন্তু আল্লাহর ফরজ হুকুম সালাত তার জন্য অতটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, যতটা কোচিং। সালাতে উঠলে বাচ্চার শরীর খারাপ করবে, কোচিংয়ে উঠলে কিন্তু করবে না। রামাদান মাসে পড়াশোনার অজুহাতে পরীক্ষার অজুহাতে... সমস্ত কিছুর নিয়ন্তা 'আল্লাহর ফরজ বিধান' সিয়ামকে 'আমি'... কত বড় কলিজা আমার? 'আমি' ফরজ সিয়ামকে আমার সন্তানের জন্য নিষ্প্রয়োজন ঘোষণা করেছি। সন্তানকে নাচ শেখাচ্ছি, গান শেখাচ্ছি। আমি কালচারাল মাইন্ডেড। কুরআন শেখানো? ওসব বড় হলে 'যদি প্রয়োজন মনে করে' শিখে নিবেনি মানে 'আমি প্রয়োজন মনে করি না'। সিয়াম রাখলে শরীর খারাপ করবে, ফজরে উঠলে শরীর খারাপ করবে। পড়ালেখা করে, এ-প্লাস পেতে হবে। সিয়াম-সালাত করলে পিছিয়ে পড়বে। আমার আর আমার সন্তানের মাঝে আল্লাহ কোথায়? এই আল্লাহ চাইলে আমার এই সন্তান দ্বারাই আমার চোখের ঘুম কেড়ে নিতে পারেন, এই আহ্লাদের সন্তানের কারণে আমাকে সমাজে ধুলোয় মিশিয়ে দিতে পারেন। সেই মহাশক্তিশালী আল্লাহর হুকুম 'আমি' স্থগিত করে দিচ্ছি। কে আমি? আমার কি একটুও ভয় লাগছে না, পরিবার থেকে আল্লাহকে বের করে দিতে? যিনি আমাকে পরিবার দিলেন তাঁকেই বের করে দিলাম।

ভালো স্কুলের নামে কাফিরদের ব্রেইন-ওয়াশিং (পড়ুন মিশনারি) স্কুলে কাফিরের হাতে তুলে দিচ্ছি সন্তানের আনকোরা মগজ। স্রেফ দুনিয়ার জন্য। আক্কেল-দানাই ব্যাংকের ভল্টে নাকি? লাজ-শরম-আকল কিছুই আর নিজের কাছে নেই জনাব? আধুনিক হবার জন্য বাপ হয়ে মেয়েকে এমন পোশাক কিনে দিই, যেটা পরে আরেক মেয়ে হেঁটে গেলে নিজেই জুলজুল করে চেয়ে থাকি। নিজে মা হয়ে, যুবতী মেয়েকে তাই পরাই, যা নিজে পরার কথা চিন্তাও করতাম না। আমরা তো এমন ছিলাম না ভাই? আজ কীসে আমাদের এমন করল? কে আমাদের এমন প্রতিবন্ধী, চিন্তাশক্তিহীন, 'ভেড়ার তোড়ে ভাসমান' করে দিলো?

আপনার আর আপনার সন্তানের মাঝে 'আল্লাহ' নামের একজন ছিলেন। তাঁকে চেনানো আপনার দায়িত্ব ছিল। তাঁর দিকে আমার সন্তানকে আকর্ষিত করার দায়িত্ব আমারই ছিল। আমার সন্তান আজ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' শুনলে বলে, এটা তো ফকিরদের গান। 'ব্যা ব্যা ব্ল্যাকশিপ' পারে, পুরো 'অপরাধী' গানটা পারে; নাজাতের কালিমাটা পারে না। বলিউড হিরোদের চেনে, ৪ খলিফাকে চেনে না নবিকে চেনে না।

শাইখ উমায়ের কোব্বাদি বলেছিলেন, আমরা ভাবি, আমার মৃত্যুর পর আমার সন্তানের কী হবে। কেউ ভাবি না, আমার সন্তানের মৃত্যুর পর তার কী হবে? ১০ বছর বয়সে সালাত না পড়লে সন্তানকে প্রহারের হাদিস:

৭ বছর বয়সে তোমাদের সন্তানকে সালাত আদায়ের জন্য আদেশ করো আর ১০ বছর বয়সে সালাত এর জন্য।

এখন বাবা মা সন্তানকে মারে ক্লাসে ফার্স্ট না হওয়ার জন্য, সালাতের জন্য তার কোনো শাসন থাক বা না থাক।

আহ মুসলিম, আপনার এই সন্তান যখন জাহান্নামি হবে, আল্লাহকে ফরিয়াদ করবে: মালিক, আমার বাপ-মা আমাকে ফার্স্ট হতে পারিনি বলে মেরেছে, স্কুল পালিয়েছি বলে মেরেছে, এ-প্লাস পাইনি বলে বকেছে। তোমার হুকুম সালাতের জন্য আমাকে বকেনি, তোমার হুকুম ভেঙেছি বলে কখনো মারেনি। আজ এই বাপ-মাকে দোযখে দ্বিগুণ শাস্তি দাও।

ঘর সয়লাব মূর্তি আর প্রাণীর ছবিতে। প্রগতির নামে, সংস্কৃতির নামে, সজ্জার নামে মুসলিমের ড্রয়িং-রুম জন্তু-জানোয়ার, লালন-রবীন্দ্র-নজরুল, মৃত বাপ-মায়ের শোপিসে ছবিতে ভর্তি। ছবি-মূর্তিতে রহমতের ফেরেশতা ঢোকে না। আযাবের ফেরেশতাদের কিন্তু এসবের তোয়াক্কা নেই। আরো আছে। সেকেন্ডে ৩৬টা স্টিল পিকচার বা ৩৬ ফ্রেম গেলে নাকি তাকে বলে মুভি বা ভিডিও। ঘরে সে জিনিসও আছে। থাক, বললে দ্বীনদাররাও তেড়ে আসবেন। চেপে গেলাম। নিজেকে উদারমনা, প্রগতিমনা, ধর্মের খুটোছেঁড়া প্রমাণের কত চেষ্টা আমাদের। ভেবেছেন একবার, আধুনিক হবার নামে 'পশ্চিমা' হবার, সংস্কৃতিমনা হবার নামে 'হিন্দু' হবার এই হিড়িক আমাদের দুনিয়াতেই কোথায় নিয়ে ফেলবে? সেক্যুলার-মনা হবার নামে আল্লাহকে ত্যাগ করার এই স্পর্ধা আখিরাতে আমাদের কোথায় নিয়ে ফেলবে? আফটার-অল যদি আখিরাতে বিশ্বাস থাকে।

মুসলিমদের অন্তরে দ্বীন বিকৃত ও বিনষ্ট করার জন্য সেকুলার বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

মুসলিমদের দ্বীন বিকৃত করার নিমিত্তে সেকুলার বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে থাকে, যেমন:

১. দুর্বল প্রকৃতি ও দোদুল্যমান ঈমানদার লোকদেরকে সম্পদ ও পদের প্রলোভন দেওয়া, অথবা নারীর টোপ দেওয়া, যেন তারা সেকুলারিজম বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার বাণী ও শ্লোগান মানুষের কর্ণকুহরে প্রবেশ করাতে ও প্রচার করতে পারে। অবশ্য তার পূর্বেই তারা তাদের প্রতারণার শিকার লোকদেরকে বিভিন্ন মিডিয়ায়, যেগুলোতে তাদের কর্তৃত্ব রয়েছে, সেগুলোতে এমনভাবে তুলে ধরে যেন মানুষ তাদেরকে আলেম, চিন্তাবিদ ও প্রচুর জান্তা হিসেবে জানে এবং সাধারণ লোকদের নিকট তাদের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়, অতঃপর তাদের দ্বারা সেকুলারিজম বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতা প্রচার করায়, এভাবে তারা অনেক মানুষকে ধোঁকা দিতে সক্ষম হয়।

২. কতিপয় লোককে তারা পাশ্চাত্য দেশে সেকুলার বা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদীদের আশ্রমে লালন করে এবং তাদেরকে একাডেমিক বিভিন্ন নামী-দামী পদবি প্রদান করে, যেমন 'ডক্টরেট' অথবা 'প্রফেসর' ইত্যাদি। অতঃপর সেখান থেকে প্রর্ত্যাবর্তন করার পর দ্বীনকে বিকৃত ও ভিন্নভাবে উপস্থাপনের জন্য তাদেরকে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগ দেওয়ার সুযোগ করে দেয়। এ থেকে আমরা অনুমান করতে পারি যে, আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে তাদের অস্তিত্ব কতটুকুন ক্ষতিকর; অথচ তারাই সুশীল নামে খ্যাত, স্কুল-কলেজ ও ভার্সিটির কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব তাদের হাতেই ন্যাস্ত।

৩. এ মতবাদে বিশ্বাসী লোকদের অপর একটি কূটকৌশল হচ্ছে, দ্বীন বা ধর্মকে বিভক্ত করা, তার নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর সমালোচনা ও লেখা-লেখি করা এবং মানুষদেরকে তাতে ব্যস্ত রাখা। এ লক্ষ্যে তারা দীনি ছাত্র, ধর্মীয় আলেম ও ইসলামের দিকে আহ্বানকারী দা'ঈদের সাথে অযথা তর্কে লিপ্ত হয়, যেন তারা মানুষদেরকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপদেশ-নসিহত প্রদানের পরিবর্তে তর্কে ব্যস্ত থাকে।

৪. দীনি আলেম, ধর্মীয় ছাত্র ও আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী দা'ঈদেরকে রেডিও-টেলিভিশন ও বিভিন্ন মিডিয়ায় পশ্চাৎগামী, চারিত্রিকভাবে অধঃপতিত ও দ্বিতীয় শ্রেণির লোক হিসেবে উপস্থাপন করা। আরো প্রচার করা যে, তারা পদ, সম্পদ ও নারী লোভী, যেন মানুষেরা তাদের কথায় বিশ্বাস না করে ও ধর্মনিরপেক্ষতা প্রচারের ময়দান উন্মুক্ত হয়।

৫. বিরোধপূর্ণ মাসআলা ও আলেমদের ইখতিলাফ নিয়ে বেশী আলোচনা করা, যেন মানুষ জানে দ্বীন মতবিরোধের স্থান এবং দীনি আলেমদের মাঝে কোনো ঐক্য নেই। এভাবে মানুষ বিশ্বাস করতে শিখবে যে, দ্বীনের কোনো বিষয় অকাট্য ও চূড়ান্ত নয়, অন্যথায় এতো বিরোধ সংগঠিত হত না। ধর্মনিরপেক্ষতার অনুসারীরা এ দিকটার প্রতি খুব গুরুত্বারোপ করে। মুসলিম সমাজে ধর্মনিরপেক্ষতার কুপ্রভাব ছড়ানোর লক্ষ্যে এ জাতীয় বিষয়কে তারা বড় আকারে পেশ করে, যার অর্থ মুসলিমদেরকে তাদের দ্বীন থেকে দূরে রাখা।

৬. পাশ্চাত্য দেশসমূহের আদলে বিভিন্ন স্কুল-কলেজ-ভার্সিটি ও অপরিচিত কালচার সেন্টার নির্মাণ করা। এসব প্রতিষ্ঠান মুসলিম দেশে নির্মিত হলেও পরিচালিত হয় প্রকৃতপক্ষে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে। ইসলামের সাথে মুসলিমদের সম্পর্ক দুর্বল করার লক্ষ্যে তারা চেষ্টার ত্রুটি করে না। একই সাথে ধর্মনিরপেক্ষতার বিষবাষ্প ছড়ানোর কাজও করে ব্যাপকভাবে, বিশেষ করে সামাজিক, দার্শনিক ও মনোবিদ্যা বিভাগে তাদের পদচারণা ও প্রচারণা খুব বেশী।

৭. শরীয়তের কতক বিধান, যার প্রয়োগ ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ ও সুনির্দিষ্ট নিয়মনীতি রয়েছে, তার উপর স্থানকাল-পাত্র ও বিধিনিষেধের তোয়াক্কা না করে অন্ধভাবে জমে থাকা। এভাবে তারা শরীয়তের ভুল ও বিকৃত দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে ধর্মনিরপেক্ষতা বা তার অধিকাংশ লক্ষ্য বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করে।

উদাহরণত শরীয়তের একটি নীতি **'মাসালেহে মুরসালাহ'(** জনস্বার্থ) নীতিকে তারা উল্টোভাবে বুঝে ও ভুল পথে প্রয়োগ করে, অতঃপর তার দোহাই দিয়ে ইসলামের যে অংশ তারা পছন্দ করে না তা প্রত্যাখ্যান করে ও ধর্মনিরপেক্ষতার বিধানগুলো বাস্তবায়ন করে, যেকারণে মুসলিম দেশে ধীরেধীরে ধর্মনিরপেক্ষতা শক্তিশালী ও তার ভিত্তিসমূহ মজবুত হচ্ছে।

অনুরূপ শরীয়তের আর একটি নীতি রয়েছে: "দু'টি ক্ষতিকর বস্তু থেকে কম ক্ষতিকর বস্তু ও দু'টি ফেতনা থেকে ছোট ফেতনাকে গ্রহণ কর"। আরেকটি নীতি রয়েছে: "প্রয়োজন নিষিদ্ধ বস্তুকেও বৈধতা প্রদান করে"।
আরেকটি নীতি রয়েছে: টেগল
"ফায়দা হাসিল করার চেয়ে ক্ষতি দূর করাই অধিক শ্রেয়"। অনুরূপ একটি নীতি হচ্ছে: "ইসলাম সর্বযুগে উপযোগী"। আরেকটি নীতি রয়েছে: "অবস্থার ভিন্নতার ভিত্তিতে ফতোয়া

ভিন্ন হয়"। এ জাতীয় নীতিকে তারা গলদভাবে প্রয়োগ করে অন্যান্য ধর্ম ও মতবাদের সাথে ইসলামকে গুলিয়ে ফেলে ও মুসলিমদের ধোঁকা দেয়।

অনুরূপ এসব নীতিকে তারা কাফেরদের দেশে প্রচলিত অর্থনৈতিক বিধান, রাজনৈতিক ভাবনা ও দর্শনকে মুসলিম দেশে আমদানি করার হাতিয়ার হিসেবে গলদভাবে প্রয়োগ করে, যেন অধিকাংশ মানুষ প্রকৃত অবস্থা না জেনে বদ্দীন ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

আমার দৃষ্টিতে তাদের এ কৌশল সবচেয়ে বিপজ্জনক ও ভয়ঙ্কর, কারণ এতে মানুষ সন্দেহ ও ধোঁকায় পতিত হয়, তারা ভাবে এসব তো শরয়ীতের নীতি ও ইসলামের নিকট স্বীকৃত। তাদের এ কৌশলের মুখোশ উন্মোচনের জন্য স্বতন্ত্র কিতাব প্রয়োজন, তবেই দ্বীন থেকে সন্দেহ ও অস্পষ্টতা দূর করা সম্ভব হবে এবং মানুষকে স্পষ্টভাবে বুঝানো যাবে।

এখানে আমরা স্পষ্ট করতে চাই যে, এ জাতীয় নীতির উপর তাদের ভরসা করার অর্থ এ নয় যে, তারা ইসলামের এসব নীতিতে বিশ্বাসী। আবার এ অর্থও নয় যে, যে-উৎস থেকে এসব বিধান এসেছে, সে ইসলামের ব্যাপ্তি, ব্যাপকতা ও পরিপূর্ণতার উপর তাদের ঈমান রয়েছে, বরং এসব তাদের একটি বাহানা, এভাবে তারা নিজেদের অসৎ উদ্দেশ্য ও ভ্রান্ত মতবাদ বাস্তবায়ন করতে চায়।

মুসলিমদের দায়িত্ব

লেখক যদি কোনো কিতাবের ব্যাপক প্রচার ও প্রসিদ্ধ চায়, তাহলে সে অবশ্যই মানুষকে আকৃষ্ট করা ও তাদের মাঝে আগ্রহ সৃষ্টির জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করে। অতএব যদি সত্যিই হয় যে, এ জাতীয় কিতাবের প্রতি মানুষের আগ্রহ নেই, তাহলে তাদের অনাগ্রহের জন্য আপনারাও কম দায়ী নন, তাদের অনাগ্রহের প্রতি আপনাদের সন্তুষ্টি প্রকাশ পাচ্ছে। তাদেরকে আপনারা বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করতে দেননি, তাদেরকে বলনেনি এক বিষয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করে অপর বিষয় ত্যাগ করা সমীচীন নয়। এরূপ ঘটতে থাকলে মানুষেরা ইসলামকে কোনো এক ইবাদত, অথবা কোনো এক আদব অথবা কোনো এক অভ্যাসে সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ করে ফেলবে, বরং অনেকের নিকট তো এখনই সালাত, সিয়াম ও কতক জিকিরের মাঝে ইসলাম সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। কেউ ইসলামকে সীমাবদ্ধ করেছে শুধু সদাচরণে। কারো নিকট বিশেষ অবস্থা অথবা বিশেষ আকৃতি অথবা বিশেষ পোশাকের নাম-ই ইসলাম। কারো নিকট কয়েকটি ফিকহি মাসআলার মধ্যে সীমাবদ্ধ ইসলাম, অথবা কিছু বিষয়-আশয় ও কিছু স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয় জানাই ইসলাম, ইত্যাদি।

আপনি যদি তাদেরকে ইসলামের ব্যাপ্তি ও ব্যাপকতার প্রতি দাওয়াত দেন, তার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন, যেমন আল্লাহর তাওহীদ, আখিরাতের প্রতি ঈমান, আল্লাহর বিধান মোতাবেক ফয়সালা করা ও তার শরীয়ত আঁকড়ে ধরা; অথবা ইসলামী খিলাফত পুনরুদ্ধার ও কায়েম করার আলোচনা এবং কুফরি মতবাদসমূহের বাতুলতা প্রকাশ করেন, যেমন গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা ইত্যাদি, তাহলে তারা ভাববে আপনি ইসলাম ছাড়া অপর কোনো বিষয়ে আলোচনা করছেন। তারা বলবে, 'এটাই তো রাজনীতি, আর রাজনীতির সাথে দ্বীনকে সম্পৃক্ত করা বৈধ নয়।'

এ জাতীয় বিশ্বাসে বিশ্বাসী লোকদের জন্য যদি সেসব বিষয় জুমার খুতবা, মসজিদের হালকা, বিভিন্ন সেমিনার ও ছোট ছোট কিতাবে প্রকাশ করা হত, যা পড়া ও বুঝা সহজ, তাহলে তাদের থেকে এরূপ বিচ্যুতিমূলক কথা কখনো বের হত না।

আমরা আমাদের ও অধীনদের ক্ষেত্রে বাস্তব বিশ্বাসে বিশ্বাসী হব ও তার উপর আমল করব। এতেই ক্ষান্ত হব না, বরং মানুষদেরকে আহ্বান করব ও ইসলামের হাকিকত সম্পর্কে বুঝাব। কিভাবে আমাদের শত্রুরা ভেতরে-বাইরে আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে তাদেরকে সেগুলো সম্পর্কে সতর্ক করব। মুসলিম উম্মাহ বর্তমান কি পরিমাণ দুর্দশায় ভোগছে তাও তুলে ধরব তাদের সামনে। কোনো কষ্ট, বাঁধা ও বিরোধিতা আমাদেরকে এ দায়িত্ব থেকে বিরত রাখতে পারবে না। যদিও সেক্যুলারিজমের অনুসারী ও তার দোসররা আমাদেরকে কোণঠাসা করে কিংবা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, আমরা তার থেকে পিছপা হব না কখনো।

অবশ্যই আমাদেরকে দ্বীনের স্বার্থে দ্বীন মোতাবেক কাজ করতে হবে। আল্লাহ ও তার রাসূলের পছন্দনীয় আকিদা, কথা ও কর্মের উপর মানুষদের উঠাতে হবে, প্রয়োজনে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে হবে। আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণাকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে, যেন ফিতনা দূরীভূত হয় ও একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়।

সেক্যুলার আধিপত্য ভাঙ্গা এবং ইসলামকে সামাজিক শক্তি হিসেবে হাজির করার জন্য অফলাইনের কাজ কেমন হতে পারে?

কাজগুলো তালিকা আকারে নিম্নরূপ:

ইসলামবিদ্বেষ নিয়ে সচেতনতা/গবেষণা: বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইসলামবিদ্বেষ নিয়ে কাজ করার জন্য "ক্লাব" বা "কেন্দ্র" তৈরি করা যেতে পারে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এরকম একটা উদ্যোগ আগে থেকেই চলছে, সেটার অনুকরণে বা অন্য কোন ভাবে হতে পারে।

এধরণের প্ল্যাটফর্মের উদ্দেশ্য হবে কর্মক্ষেত্রে, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং জনপরিসরে ঘটা ইসলামবিদ্বেষের ঘটনাগুলো নিয়ে সচেতনতা তৈরি করা। সমাজে থাকা ইসলামবিদ্বেষের আদর্শিক শেকড় মানুষের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করা। ইসলামবিদ্বেষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা। এবং সাধ্যমত ইসলামবিদ্বেষের শিকার মুসলিমদের; বিশেষ করে আমাদের বোনদের পাশে দাঁড়ানো।

সম্ভাব্য কার্যক্রম: বাংলা সাহিত্যে ইসলামবিদ্বেষ, সংবাদ ও সাংবাদিকতায় ইসলামবিদ্বেষ, পপুলার মিডিয়াতে ইসলামবিদ্বেষ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইসলামবিদ্বেষ, চাকরির নিয়োগে ইসলামবিদ্বেষ, "সুশীল সমাজের" বক্তব্যে ইসলামবিদ্বেষ – এই ধরণের বিষয়গুলো নিয়ে বিশেষভাবে কাজ করা যেতে পারে। পশ্চিমে এধরনের অনেক অ্যাকাডেমিক কাজ হয়েছে (বিশেষ করে ইহুদীবিদ্বেষ ও বর্ণবৈষম্য নিয়ে) সেগুলো থেকে আইডিয়া নেয়া যেতে পারে।

জরিপ, গবেষণা প্রতিবেদন, আলোচনা, স্টাডি সার্কেল, লিফলেটিং, ওয়ার্কশপ, সেমিনার, ওয়েবিনার, সমাবেশ, সংবাদ সম্মেলন, প্রতিকী প্রতিবাদসহ বিভিন্ন ধরণের পদ্ধতি সাধ্যমত এখানে কাজে লাগানো যেতে পারে।

লিগ্যাল এইড: খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাস্তব দুনিয়াতে কাজ করতে গেলে বাঁধাবিপত্তি আসবেই। অনেক ক্ষেত্রে হয়রানিমূলক গ্রেফতারি বা মামলার ভয় দেখানো হতে পারে। এছাড়া মিছিল থেকে গ্রেফতারের দৃষ্টান্তও আমরা দেখেছি। এসব ক্ষেত্রে আইনী সহায়তা দেয়ার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। আইনজীবিদের সাথে যোগাযোগ, খরচ, সমন্বয় এই ধরণের বেশ কিছু কাজ এখানে থাকে। আলিমদের তত্ত্বাবধানে তরুণ আইনজীবি ভাইরা এধরনের উদ্যোগ নিতে পারেন।

সম্ভাব্য কার্যক্রম: শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বা কর্মক্ষেত্রে ইসলাম পালনের জন্য বৈষম্য ও প্রশাসনিক হয়রানির শিকার মুসলিমদের আইনী সহায়তা দেয়া।

ইসলামী ইতিহাস: বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ইসলামী ইতিহাস নিয়ে আলোচনার জন্য ক্লাব/কেন্দ্র/সোসাইটি তৈরি হতে পারে।

সম্ভাব্য কার্যক্রম: আলোচনা, স্টাডি সার্কেল, বই পড়া প্রতিযোগিতা, গবেষণামূলক প্রবন্ধ তৈরি, উপমহাদেশে ইসলামের ইতিহাস, বাংলায় মুসলিম শাসন, আমাদের মুসলিম পরিচয়, বিখ্যাত ঐতিহাসিক ব্যক্তি ও আন্দোলন নিয়ে আয়োজন (বালাকোট, ফরায়েজী, তিতুমীর, পাটনা আন্দোলন, দেওবন্দ আন্দোলন ইত্যাদি)।

পাশাপাশি ওয়ার্কশপ, সেমিনার, ওয়েবিনারসহ বিভিন্ন ধরণের পদ্ধতি সাধ্যমত এখানে কাজে লাগানো যেতে পারে। এধরণের ম্যাটেরিয়াল নিয়ে মুসলিম ইতিহাসভিত্তিক পডকাস্ট বা ইউটিউব ভিডিও-ও বানানো যেতে পারে। যদিও এটা অনলাইনের কাজ, তবে প্রাসঙ্গিক হওয়াতে উল্লেখ করা হল।

ইসলামী চিন্তা ও সভ্যতা: ইসলামী ইতিহাসের অনুরূপ। এখানে বিশেষভাবে সমাজ, সভ্যতা ও শাসন নিয়ে মুসলিম উলামা এবং চিন্তাবিদদের ধারনার ওপর ফোকাস করা যেতে পারে। আল-গাযযালি, ইবনু খালদুন, ইবনু তাইমিয়াহ, শাহ ওয়ালিউল্লাহ, শাহ ইসমাইলসহ অতীত ও নিকটবর্তী অতীতের আরো অনেককে নিয়েই কাজ করা যেতে পারে। রাহিমাহুমুল্লাহ।

সম্ভাব্য কার্যক্রম: ইসলামী ইতিহাসের অনুরূপ।

অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে ইসলাম: এ ধরণের কেন্দ্র/ক্লাবের মাধ্যমে ইসলামের শিক্ষার আলোকে বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

সম্ভাব্য কার্যক্রম: আলোচনা, স্টাডি সার্কেল, গবেষণামূলক প্রবন্ধ তৈরি। ইসলামী অর্থনীতির ক্ষেত্রে আলোচনা হতে পারে সুদের ভয়াবহতা, ব্যাংকিং ব্যবস্থার বাস্তবতা, আন্তর্জাতিক ঋণের বাস্তবতা, ওয়াকফ-সাদাকাহ-যাকাতের আর্থসামাজিক সম্ভাবনা, দারিদ্র্য বিমোচনে করযে হাসানা ভিত্তিক মাইক্রোফাইন্যান্সের সফলতা ও সম্ভাবনা, ফিনটেকের সাথে সমন্বয় করে মুশারাকা-মুদারাবাসহ সাদাকা ও ওয়াকফের প্রয়োগসহ নানা বিষয় নিয়ে।

সম্ভাব্য কার্যক্রম: আলোচনা, স্টাডি সার্কেল, বই পড়া প্রতিযোগিতা, গবেষণামূলক প্রবন্ধ তৈরি, উপমহাদেশে ইসলামের ইতিহাস, বাংলায় মুসলিম শাসন, আমাদের মুসলিম পরিচয়, বিখ্যাত ঐতিহাসিক ব্যক্তি ও আন্দোলন নিয়ে আয়োজন (বালাকোট, ফরায়েজী, তিতুমীর, পাটনা আন্দোলন, দেওবন্দ আন্দোলন ইত্যাদি)।

অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে ইসলাম:এ ধরণের কেন্দ্র/ক্লাবের মাধ্যমে ইসলামের শিক্ষার আলোকে বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

সম্ভাব্য কার্যক্রম: আলোচনা, স্টাডি সার্কেল, গবেষণামূলক প্রবন্ধ তৈরি। ইসলামী অর্থনীতির ক্ষেত্রে আলোচনা হতে পারে সুদের ভয়াবহতা, ব্যাংকিং ব্যবস্থার বাস্তবতা, আন্তর্জাতিক ঋণের বাস্তবতা, ওয়াকফ-সাদাকাহ-যাকাতের আর্থসামাজিক সম্ভাবনা, দারিদ্র্য বিমোচনে করযে হাসানা ভিত্তিক মাইক্রোফাইন্যান্সের সফলতা ও সম্ভাবনা, ফিনটেকের সাথে সমন্বয় করে মুশারাকা-মুদারাবাসহ সাদাকা ও ওয়াকফের প্রয়োগসহ নানা বিষয় নিয়ে।

মনোদৈহিক সমস্যার সমাধানে ইসলাম:ইসলামের আলোকে মনোবিজ্ঞান, আধুনিকতার তৈরি মানসিক সমস্যার সমাধানে তাযকিয়াতুন নাফস, তাসাউফ, কানা' (সন্তুষ্টি), যুহুদ, মুসলিম আলিমদের চিন্তার আলোকে মানসিক সমস্যার কারণ ও সমাধান-কাজ হতে পারে এধরনের বিভিন্ন টপিকে।

সম্ভাব্য কার্যক্রম: মনোদৈহিক ও সামাজিক বিষয়ের ক্ষেত্রে নিয়ে আল-গাযযালি, ইবনুল জাওযী, ইবনুল কাইয়্যিম, আবু যাইদ আল-বালখীসহ বিভিন্ন মুসলিম ব্যক্তিদের চিন্তা ও গবেষণা নিয়ে আয়োজন। উবুদিয়্যাহর ধারণা নিয়ে আলোচনা। ডিপ্রেশন-সুইসাইড-অবক্ষয়ের সমাধানে ইসলাম, ওয়ার্কশপ, সেমিনার, ওয়েবিনার, বুকলেট তৈরি, ডেইলি প্ল্যানার তৈরি, রমাদ্বান ও যুল হিজ্জার ইবাদাত উপলক্ষে বিশেষ ওয়ার্কশপ ইত্যাদি।

পাশ্চাত্যবাদ: ইসলামের প্যারাডাইম থেকে মডার্নিটি এবং এর মতবাদগুলোর খণ্ডন। বিশেষ সেক্যুলার জমিদারদের বহুল ব্যবহৃত মতবাদগুলোর খণ্ডন। এ বিষয়ে আমি অন্যান্য জায়গাতে বেশ লেখালেখি করেছি, তাই এখানে আলাদাভাবে আনলাম না।

সম্ভাব্য কার্যক্রম: বাছাই করা বই পড়া, গবেষণামূলক প্রবন্ধ, খণ্ডনমূলক প্রবন্ধ, শর্ট কোর্স, আলোচনা, ওয়ার্কশপ, ইউটিউব ভিডিও, পডক্যাস্ট ইত্যাদি।

সামাজিক অবক্ষয়ের মোকাবেলায় ইসলাম: এধরনের প্ল্যাটফর্মের অধীনে বিভিন্ন সামাজিক অবক্ষয় নিয়ে কাজ করা যেতে পারে। যেমন – পর্নোগ্রাফি, যিনা/প্রেম, স্ক্রিন আসক্তি, পরিবারের ভাঙ্গন, মাদকাসক্তি ইত্যাদি।

সম্ভাব্য কার্যক্রম: লিফলেটিং, আলোচনা, স্টাডি সার্কেল, স্ট্রিট দাওয়াহ, ওয়ার্কশপ, সেমিনার, ওয়েবিনার, বিষয়ভিত্তিক বুকলেট ছাপানো, কিশোরতরুণদের নিয়ে এলাকাভিত্তিক বিভিন্ন কর্মসূচী, বিভিন্ন প্রতিযোগিতা আয়োজন (খেলা কিংবা অন্যান্য) ইত্যাদি। এধরণের ম্যাটেরিয়াল নিয়ে মুসলিম ইতিহাসভিত্তিক পডকাস্ট বা ইউটিউব ভিডিও-ও বানানো যেতে পারে। যদিও এটা অনলাইনের কাজ, তবে প্রাসঙ্গিক হওয়াতে উল্লেখ করা হল।

পড়াশুনা, ক্যারিয়ার এবং বিয়ে নিয়ে দুশ্চিন্তা যেহেতু বর্তমানের তরুণদের জন্য বড় একটা সমস্যা তাই ক্যারিয়ার অ্যাডভাইস এবং ম্যারিটাল কাউন্সেলিং নিয়েও কাজ করা যেতে পারে।

ইলম: প্রাথমিক ইলম অর্জন সংক্রান্ত কার্যক্রমের জন্য ক্লাব/কেন্দ্র বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শুরু করা যেতে পারে।

সম্ভাব্য কার্যক্রম: তাজউয়ীদ শিক্ষা, প্রাথমিক আকীদাহ (তাওহীদ, ঈমান, কুফর, শিরক, বিদআহ, আল ওয়ালা ওয়াল বারা, নাওয়াকিদুল ইসলাম), ফারযুল আইন মাসায়েল, শরীয়াহর অপরিহার্যতা, তাযকিয়াতুন নাফস, সীরাত শিক্ষা, প্রাথমিক তাফসীর, চল্লিশ হাদীস, দৈনন্দিন জীবনে সুন্নাহ পালন, উবুদিয়্যাহর ধারণা ও শিক্ষা, আরবী শিক্ষা, ইত্যাদি।

দাওয়াতী ও ইসলাহী প্ল্যাটফর্ম: ইসলামী অ্যাক্টিভিসম বলতে সাধারণত আমাদের দেশে এধরনের কাজকেই বোঝানো হয়, তাই এ নিয়ে আলাদাভাবে কথা বলার প্রয়োজন নেই। ইসলাহী দাওয়াহর পাশাপাশি ওপরের অনেকগুলো কনসেপ্ট এই ধরণের প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমেও বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

এছাড়া শরীয়াহ শাসন এবং আমর বিল মা'রুফ ও নাহি আনিল মুনকারের বিষয়গুলো এধরণের প্ল্যাটফর্মে বিশেষভাবে গুরুত্ব পাওয়া উচিৎ। দ্বন্দ্বমূলক (confrontational) মনোভাব, হুমকি-ধামকি, আলটিমেটাম ইত্যাদির বদলে নাসীহাহ, শিক্ষাদান, সতর্ক করার আদলে আলোচনা আসলেই উত্তম হবে।

পাশাপাশি ম্যাগাযিন ছাপানো, ক্যালিগ্রাফি প্রতিযোগিতা, ইসলামী কবিতা, সেমিনার ও ইস্যুভিত্তিক অন্যান্য আয়োজন হতে পারে। প্রফেশানালরাও (অর্থাৎ যারা ছাত্র জীবন পার হয়ে

এসেছেন) তা বিভিন্নভাবে এ ধরণের অ্যাক্টিভিসমের যুক্ত হতে পারেন। যারা সক্রিভাবে যুক্ত হতে পারবেন না তারা নেটওয়ার্কিং এর মাধ্যমে এবং ফান্ডিংসহ অন্যান্য পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে এধরনের উদ্যোগে অংশগ্রহণ করতে পারেন। চ্যারিটি এবং সমাজসেবামূলক বিষয়ে নিয়ে কাজ করা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানও সামর্থ্য অনুযায়ী উল্লিখিত বেশ কিছু ফরম্যাটের কাজ তাদের নিজের প্ল্যাটফর্মের যুক্ত করতে পারেন।

উল্লেখ্য এই কাজগুলো মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ না। অর্থাৎ কেউ একটা করলে অন্যগুলো করতে পারবে না, ব্যাপারটা এমন না। সুযোগ ও সামর্থ্য অনুযায়ী এক প্ল্যাটফর্মে উল্লিখিত একাধিক ধরণের কাজ হতে পারে।

(চিন্তাপরাধ -আসিফ আদনান বই থেকে)

ইসলামীকৃত সেক্যুলারিজম

ইসলামপন্থীদের সাথে সেকুলারিজমের সাথে আপোস

ইসলামপন্থীদের সাথে সেকুলারিজমের আপোষকে বলা যায় সেকুলারিজমের ইসলামিকরণ বা ইসলামিকৃত সেকুলারিজম। এটি একটি সংস্কারবাদী প্রকল্প।

আধুনিক ইসলামী চিন্তার জগতে ইসলামপন্থী অনেকের মাঝে সেকুলারিজমের সাথে আপসের মানসিকতা লক্ষ করা যায়। এই আপসকামিতার পেছনে কিছু শরয়ী ভিত্তি, মাসলাহা ও রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার প্রভাব বিদ্যমান।

মূলত আমরা এক স্পষ্ট পরিস্থিতি সামনে উপস্থাপন করতে যাচ্ছি যেটার বিবরণ ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হয়। কেউ কেউ এটি ইতিবাচকভাবে নেয়, ফলে এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়। আর কেউ কেউ এটিকে নেতিবাচকভাবে নিয়ে এর সমালোচনা করে থাকে।

বস্তুত বড় একটা বিষয়কে সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপন করতে গেলে বলা যায় যে, সেক্যুলারিজমের সাথে আপেষ বলতে বুঝাতে চাইছি, দীনে নতুনত্ব আনয়ন ও শরীয়তের বিধানের নতুন ব্যাখ্যা।

এই বিষয় বা পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত কথা বলার আগে বলে নিই- এখানে আমাদের আলোচনা ঐ ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে যিনি শরীয়তের কর্তৃত্ব স্বীকার করে নিয়েছেন। শরীয়ত অনুযায়ী শাসনের স্বীকৃতি এবং সেক্যুলারিজম অস্বীকার করা। সুতরাং কেউ যদি শরীয়তের কর্তৃত্ব নাকচ করে থাকে, এই আলোচনা তার জন্য না। বরং আলোচনার লক্ষ্য সে সকল মানুষ যারা সেক্যুলারিজমকে অস্বীকার করলেও ইসলামীকরণের নামে সেকুলার চিন্তায় প্রভাবিত হয়েছে।

এখানে সেক্যুলারিজম বলতে বুঝাতে চাইছি যে ব্যাপারটা তা হলো, দীনকে রাজনীতি থেকে আলাদা করা যায়। মানুষের সাধারণ জীবনযাত্রা পরিচালনায় দীনের কোনো প্রভাব থাকে না। তবে জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে দীনের অবস্থান স্বীকার করা হয়। অর্থাৎ মানুষের জীবনযাপনে এমন নীতি গ্রহণ করা হবে সেটার উৎপত্তি ধর্ম থেকে হলেও সেটা মানা হবে স্বার্থ ও বিবেকের দাবি পূরণের জন্য।

যে বিষয় আপোষকে প্রভাবিত করে

সেকুলারিজমের ইসলামীকরণে ভালো উদ্দেশ্যগুলো হলো:

১- ইসলামের বিধি-বিধানের সুন্দর চিত্র ফুটিয়ে তোলা।

২- ইসলামের শত্রুদের উত্থাপিত নানা সংশয়ের জবাব দেওয়া।

৩- ইসলামের বিধি-বিধান বাস্তবায়ন।

৪- পশ্চিমা সভ্যতার শক্তিমত্তার সামনে মানুষ নতজানু হয়ে যাওয়ার ভয়।

এমন আরো বেশ কিছু ভালো উদ্দেশ্য রয়েছে। আর খারাপ উদ্দেশ্য সৃষ্টির কারণ:

কিছু মানুষ দেখতে পায় সাধারণ মানুষের মনে ধর্মের অবস্থান অনেক উপরে। মুসলিমদের মনে সেকুলারিজমের ব্যাপারে খুবই নেতিবাচক অবস্থান। সুতরাং সরাসরি সেকুলারিজমের দাওয়াত দিয়ে শরীয়ত প্রত্যাখ্যান করতে বলা সম্ভব না।

আরব ও মুসলিম জাতিগুলোর মাঝে সেকুলারিজমের ব্যাপারে নেতিবাচক অবস্থানের বিষয়টি প্রসিদ্ধ। এর নানাবিধ কারণ রয়েছে। জনৈক গবেষকের মতে সেগুলো হলো-

১- সেকুলারিজম নাস্তিকতার সমার্থক এবং ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক বিষয় এটি মনে করা।

২- সেকুলারিজমের সাথে স্বৈরাচার মিশে যাওয়া।

৩- মুসলিমদের বিরুদ্ধে পশ্চিমাদের একচোখা নীতি।

৪- পশ্চিমা সেকুলারিজমের বিপরীতে গিয়ে আধুনিক ইসলামী আত্মপরিচয় দৃঢ়ভাবে মনে অবস্থান করে নেওয়া।
(নাদের হাশেমী, আল-ইসলাম ওয়াল-আলমানিয়্যা দিমুক্তাদ্বিয়্যাহ আল-লিবরাদিয়ার (২৭৯)

তবে তিনি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণটা বাদ দিয়েছেন, সেটি হলো মুসলিমদের হৃদয়ে দীনের শক্তিশালী অবস্থান। সেক্যুলারিজম দীনের মূলভিত্তির সাথে সাংঘর্ষিক। মুসলিমরা দীনের যে

অকাটা বিষয়গুলো মানে, সেক্যুলারিজম সেগুলোর বিপরীতে যায়। এই আকীদাগত মূলভিত্তিগুলো মানুষ তার আমলের চাইতে জোর দিয়ে মানে। তাই দেখা যায়, এমন অনেক মানুষ যারা ইসলামের বিভিন্ন ওয়াজিব পালনে অবহেলা করছে কিংবা হারামে লিপ্ত হচ্ছে, কিন্তু আকীদাগত মূলনীতিতে সে ছাড় দেয় না। মুসলিমদের মনে ঈমানের দৃঢ়তা তাকে সেক্যুলারিজম থেকে আবশ্যকীয়ভাবে দূরে সরিয়ে দেয়। তাই তো নতুনভাবে বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়ে আজকাল সেক্যুলারিজম চালিয়ে দেওয়ার প্রবণতা দেখা যায় ।

আপসকামিতার ফলাফল

এই আপসকামিতার অনেক নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে। তবে এত নেতিবাচক দিকের মাঝেও একটা ইতিবাচক দিক রয়েছে। সেটি হালা, এর মাধ্যমে শরীয়তের প্রতি প্রকাশ্যে সম্মান বজায় রাখা হয় এবং শরীয়ত সরাসরি প্রত্যাখ্যানের ধৃষ্টতা ওড়ানো হয়।

কিছু কিছু সেক্যুলার এতে খুবই বিরক্ত। তাদের দৃষ্টিতে এটি সেক্যুলার চিন্তার শরীষত হয় পিছু হটার লক্ষণ। সেক্যুলার আদেল দ্বাহের বলেন, সেকুলার চিন্তা যে পিছু হাটছে তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো আমরা অনেক সেক্যুলার চিন্তাবিদকে দেখতে পাই তারা নিজেদের অবস্থানকে শক্তিশালী করতে কুরআন-সুন্নাহর আশ্রয় নিচ্ছে। তারা বুঝতে পারছে না যে, এটি করার মাধানে তারা সেক্যুলারিজমের বিরোধী শক্তির সামনে সবচেয়ে বড় আদর্শিক ছাড় দিচ্ছে। সহচয়ে ভয়াবহ দিক হলো এর মাধ্যমে তারা স্ববিরোধিতা করছে। কারণ সেক্যুলারিজমের পক্ষে লড়তে গিয়ে তারা ধর্মের বক্তবাকে সর্বশেষ অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করেছে। অথচ সেক্যুলারিজমের মূল ভিত্তিই হলো ধর্মীয় বক্তব্যের উপর বিবেককে প্রাধান্য দেওয়া। (আল-উসুম আল স্কালসাফিয়্যা লিল-আলমানিয়্যা (পু-৫)

আর নেতিবাচক প্রভাবগুলো হলো-

প্রথম প্রভাব: দীন-বিকৃতি

আপসকামী চিন্তা শরয়ী বিধানের বিকৃতি সাধন করে। শরীয়তের সাথে সাংঘর্ষিক বিষয়কে 'শরীয়ত হিসেবে উপস্থাপন করে। এতে করে আল্লাহর ব্যাপারে না জেনে কথা বলা হয়। এটি বড় ধরনের পাপ এবং বিশৃঙ্খলার উৎস।

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الفواحش ما ظهر منها وما بطن وَالْإِثْمَ وَالْبَغْى بِغَيْرِ الْحَقِّ وأن تشركوا بالله (ما لم ينزل به سلنا وأن تقولوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

الاعراف :٣٣

"বলুন, আমার রব হারাম করেছেন প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য অশ্লীলতা, পাপ ও অন্যায়ভাবে সীমালঙ্ঘন, কোনো কিছুকে আল্লাহর শরীক করা, যার কোনো সনদ তিনি নাযিল করেননি, আর আল্লাহ সম্পর্কে এমন কিছু বলা যা তোমরা জান না।" [সূরা আল-আরাফ: ৩৩]

দীন-বিকৃতি আল্লাহ ও তার রাসূলের নামে মিথ্যাচারের নামান্তর। কারণ দীন-বিকৃতি করার পর বিকৃত্তিকারী বলে 'এটি আল্লাহর দীন' অথচ বাস্তবে দীন-বিকৃতির দীন না। ফলে মানুষ দীনের ক্ষেত্রে বিচ্যুত হয়ে যায়। তারা এমন সব বিষবে বিশ্বাস করতে শুরু করে যেগুলো বিশ্বাস করা বৈধ না। আর যা বিশ্বাস করা উচিত, তা তারা ত্যাগ করে। এসবই বিকৃতির নেতিবাচক ফল।

দ্বিতীয় প্রভাব: মানুষের সাথে প্রতারণা

বিকৃতি মানুষকে ধোঁকায় ফেলে দেয়। তারা হক-বাতিলের মাঝে পার্থকা গুলিয়ে ফেলে। যারা এ সকল কাজ করে আল্লাহ তাদের নিন্দা করে বলেন,

يتأهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكلمون الْحَقِّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ . (عمران ٧١

"হে আহলে কিতাব! তোমরা কেন হককে বাতিলের সাথে মিশ্রিত করো এবং হককে গোপন করো অথচ তোমরা জানো?" [সূরা আলে ইমরান: ৭১]

আপসকামী চিন্তাগুলো মানুষকে তাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তথা তাদের দীনের ক্ষেত্রে ধোঁকা দেয়। মুসলিম ব্যক্তি নির্ভরযোগ্য কাউকে অনুসরণ করে সেটিকে দীন মনে করে। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। ফলে মানুষ প্রতারিত হয়।

তৃতীয় প্রভাব: মন্দ ও শরীয়ত-বিরোধী কাজের স্বাভাবিকীকরণ

সেকুলার চিন্তাসমূহ ইসলামিকরণের সবচেয়ে বড় নেতিবাচক প্রভাব হলো, এটি পাপাচারকে স্বাভাবিক করে তোলে। ভালো কাজের আদেশ দেওয়া এবং মন্দ কাজে নিষেধ করার বিষয়ে অভ্যস্ত হয়ে ওঠার বদলে একজন মুসলিম এসব মেনে নেওয়ায় অভ্যস্ত হয়ে উঠবে; তার বদলে ভালো কাজের 'ভালো' পরিচয় এবং মন্দ কাজের 'মন্দ' পরিচয়টাকে তার থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। মুসলিম ব্যক্তি খারাপ কাজে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে অথচ জানে না সেটি মন্দ। সে মনে করে এটি সঠিক।

যিনি হারাম করার সময় জানেনই না কাজটা হারাম, তার জন্য তা ছেড়ে দেওয়াটা কঠিন। তার উপর যদি কেউ বিশ্বাস করে এটিই দীনের সঠিক বুঝ, এর বাইরে অন্য কোনো বুঝ মানে দীনের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি, তাহলে সে হারামকে আরো শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে এবং তাওবা থেকে দূরে সরে যায়।

তৃতীয় প্রভাবের অবশ্যম্ভাবী ফলাফল হলো পরবর্তী প্রভাব:

চতুর্থ প্রভাব: সংশোধন এবং দীনে ফেরার পথ রুদ্ধ হওয়া

মুসলিম যখন ইসলামী শরীয়তের চিন্তার উপর বেড়ে ওঠে তখন সে সংশোধনের প্রকৃত সুযোগ হারিয়ে ফেলে। আল্লাহর দীনের দিকে সে ফিরে আসে না। এটি অনেকটা বিদা'আতের প্রভাবের মত।

ইসলামীকৃত চিন্তার বিস্তৃতি শরীয়তের প্রতি দাওয়াতের জোর কমিয়ে দেয়। ইসলামিকরণের সিদ্ধান্ত শরীয়ত বাস্তবায়নের ধারণার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। ফলে সাধারণ মানুষের মাঝে শরীয়তের গ্রহণযোগ্যতা হ্রাস পায়। বিপরীতে যেসব দেশে ইসলামিকরণের প্রচেষ্টা চালানো হয়নি সেগুলোতে শরীয়তের কর্তৃত্ব হ্রাস পায়নি।

এটি ধর্মীয় আত্মপরিচয়কে দুর্বল করে দেওয়ার একটি তুলনামূলক নরম পদ্ধতি।

পঞ্চম প্রভাব: সেকুলারিজমের সেতু তৈরি

সেক্যুলারিজমের ইসলামিকরণের অন্যতম নেতিবাচক প্রভাব হলো এটি একটা সেতুর মত, যেটার উপর ভর করে মানুষ সেকুলারিজমের দিকে ধাবিত হয়। যে আত্মাগুলো সেকুলারিজমকে ঘৃণা করে এবং শত্রু জেনে বড় হয়েছিল, সেগুলো আজ সেতুতে পরিণত হয়েছে। সেতুর উপর ভর করে মানুষেরা এখন সেকুলারিজমের দিকেই চলে যাচ্ছে।

আমাদের চোখের সামনে এমন কিছু মানুষের অবস্থা সুস্পষ্ট, যারা শরীয়তের প্রতি সম্মান ও ভালোবাসা রেখে বড় হয়েছিল, শরয়ী মূল্যবোধের পক্ষে তারা সবসময় লড়াই করত, কিন্তু দাওয়াতী অঙ্গনে তাদের প্রসিদ্ধি ছড়িয়ে পড়ার পর আজ তারাই সে সকল সেকুলার-লিবারেল মতাদর্শ চালু করতে চাইছে যেগুলোর বিরোধিতা ইতঃপূর্বে তারা করত। আজকাল দেখতে পাবেন তারা সেকুলারদের মতো করে ব্যক্তি-স্বাধীনতা, সম্প্রীতি, সহাবস্থান ও নাগরিকত্ব স্বীকার করে নিচ্ছে, তবে ইসলামী পোশাক পরিয়ে।

ফলে আজ তারা সেকুলারদের হাস্যরসের বস্তুতে পরিণত হয়েছে। এই ইসলামিস্টদের বক্তব্যে নতুন কিছু নেই। সেকুলারদের মূলনীতিগুলো তাদের মুখে মুখে উচ্চারিত হচ্ছে, তবে ইসলামের পোশাকে ঢেকে।

ষষ্ঠ প্রভাব: শরয়ী ধ্যান-ধারণার বিকৃতি এবং শরীয়তকে নেতিবাচক ভাবে উপস্থাপন

আপসকামিতার অন্যতম নেতিবাচক প্রভাব হলো আপসকামীরা এসব বিষয় এমনভাবে উপস্থাপন করে যেন এটিই ইসলামের সঠিক বুঝ। তারা যেন সীমালঙ্ঘনপূর্ণ চিন্তার বিপরীতে দীনের সহজতা, নম্রতা ও উদারতাকে তুলে ধরছে। এসবের কারণে প্রকৃতই যারা শরীয়তের দাওয়াত দিচ্ছে, তারা শরীয়ত থেকে দূরে সরে যায়।

আপোষকামিতায় যারা ছদ্মবেশী

ছদ্মবেশী সেকুলাররা সরাসরি সেকুলার চিন্তাধারার। শরীয়তের সেক্যুলারিজম এর মিল থাকলো কিনা এ নিয়ে তারা ভাবে না। ধোঁকায় ফেলার জন্য তারা শরীয়তের আনুগত্যের ভান ধরে।

কিছু সেকুলার ইসলাম অনুসরণের ও চেষ্টা করে। সে স্বাধীনতা, ধর্মীয় নিরপেক্ষতা, সত্য, রাষ্ট্রের কাজের ব্যাপারে সেকুলার মূলনীতি অনুসরণ করে। আবার সে ইসলামের অনুসরণের কথাও বলে।সেক্যুলার চিন্তা সবকিছুর মানদণ্ড!

লক্ষণীয় বিষয় হলো, সেক্যুলার চিন্তাই এখন সবকিছুর মানদণ্ডে পরিণত হয়েছে। কোনো কিছু গ্রহণযোগ্য নাকি প্রত্যাখ্যাত, হক্ক নাকি বাতিল সেটি নির্ধারণ করে দেয় সেক্যুলারিজমের মানদণ্ড। ধর্ম কোনো সহিংসতার অনুমোদন দিলে সেটি অগ্রহণযোগ্য এবং যুলুম। কিন্তু সেক্যুলাররা কোনো সহিংসতা করতে বললে সেটি শান্তি রক্ষার্থে এবং অন্যের সহিংসতা রোধে জরুরী সহিংসতা। ধর্মের নামে হত্যা করা ঘৃণ্য বিষয়। ধর্মের নামে দূরতম ইতিহাসের হত্যাকাণ্ডের ভয়াবহ স্মৃতি আজও মানুষের মনে রয়ে গেছে। অন্যদিকে সেক্যুলার রাষ্ট্রের জন্য হত্যা করা যৌক্তিক সহিংসতা। এর কারণে মানুষের যদি কষ্টের মুখোমুখি হতে হয় তবুও সেটি জরুরী।

[রেফারেন্স: উইলিয়াম কাভানো, উত্তরাতুল উনফ আদ-দীনী (৯-১০), জ্বালাল আসাদ, তাশাকুলাতুল আলমানিয়্যা (৯৪-৯৬), (২৪-২৮), (১৬৯-১৭০)। ইয়াদাতুন নাযার ফিল-আলমানিয়্যাহ (১০৪)]

সেক্যুলার মূল্যবোধ চাপিয়ে দেওয়ার কিছু নমুনা

মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় সেক্যুলার মূল্যবোধের উপস্থিতি কতটা বড় আর উক্ত মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক যেকোনো বিষয়কে বাধাগ্রস্ত করার ক্ষেত্রে এর যে প্রভাব সেটি জানতে পারলে কল্পিত নিরপেক্ষতার ধারণা আমাদের মন থেকে দূর হয়ে যাবে। সমাজের উপর এ সকল সেক্যুলার চিন্তার জোর-জবরদস্তির কিছু নমুনা আমি পেশ করতে চাই। উদাহরণগুলো মুসলিমদের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকবে।

আমাদের উদাহরণ একটা বিষয়কে কেন্দ্র করে থাকবে। সেটি হলো সেক্যুলারিজমের এমন হস্তক্ষেপ যা মুসলিমদেরকে স্বাধীনভাবে সবকিছু করতে বাধা দেয় অথবা তাদের উপর নিজেদের আদর্শের সাথে সাংঘর্ষিক কিছু চাপিয়ে দেয়। আমরা এখানে দুটি ক্ষেত্রকে অন্তর্ভুক্ত করব না:

প্রথম ক্ষেত্র: কল্যাণ সাধনের জন্য হস্তক্ষেপ। রাষ্ট্রের যে অংশ ধর্মের সাথে কোনোভাবে সাংঘর্ষিক নয়, সে অংশে রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম পরিচালনা করা। এই ক্ষেত্রটা অনেক বড়, আধুনিক মানুষের জীবনকে পুরোপুরি আচ্ছাদিত করে আছে।

দ্বিতীয় ক্ষেত্র: এমন কিছু চাপিয়ে দেওয়া যেগুলো ইসলামের সাথে মিলে। যেমন- আত্মহত্যা, গর্ভপাত, অশ্লীল ছবি-ভিডিও প্রভৃতি নিষিদ্ধ করা। মানুষের অঙ্গ পরিবর্তনকেও বাধাগ্রস্ত করা।

১- সরকারী চাকুরিতে বিভিন্ন শর্তারোপ

সেক্যুলার কিছু মূল্যবোধ ব্যক্তিকে চাকুরিরত অবস্থায় তার ধর্মচর্চার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে। যেমন: বিচারক, পুলিশ বা কারাগারের কয়েদিদেরকে ধর্মীয় কোনো চিহ্ন প্রকাশ করতে নিষেধ করা হয়। কারণ তাদের চাকুরিগুলো খুবই সংবেদনশীল।

হয়তো এখানে কেউ বলতে পারে, এই চাকুরিগুলো যেহেতু খুবই সংবেদনশীল, সেহেতু এগুলোর ভিন্নভাবে দেখা হবে। যেমন- নিরাপত্তা বা বিচারকার্য পরিচালনা। কিন্তু বিষয়টি এতে সীমিত না। বরং শিক্ষাপ্রদানের ক্ষেত্রেও এমন শর্তারোপ করা হয়। সরকারী চাকুরি করে

এমন কারো জন্য ধর্মীয় প্রতীক ধারণা করাই নিষিদ্ধ। সে এমন কিছু করতে পারবে না যেটা তার চাকুরির সাথে সাংঘর্ষিক। উদার সেক্যুলাররা যারা ধর্মীয় কোনো চিহ্ন প্রকাশ ব্যক্তি স্বাধীনতা মনে করে, তারাও কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একজন নারীর নিকাব পরাকে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানায়।

নিকাব পরিহিতা একজন নারীর উপস্থিতিতে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখায়। নিকাব পরতে নিষেধ করার পক্ষে বেশ কিছু যুক্তিও প্রদর্শন করে।

যেমন-

১. এই 'স্বাধীনতা' একজন শিক্ষিকাকে তার শিক্ষণকার্য যথাযথভাবে পরিচালনা করতে দেয় না। মুখ ঢেকে রাখলে শিক্ষার্থীরা পূর্ণ যোগাযোগ থেকে বঞ্চিত হয়।

২. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব হলো শিক্ষার্থীদের 'সভ্য' হওয়ার শিক্ষা প্রদান করা। কিন্তু নিকাব পরা সভ্য হওয়া থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

৩. প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এখনও যথেষ্ট বুদ্ধিবৃত্তিক স্বাতন্ত্র্য অর্জন করতে সমর্থ হয়নি। শিক্ষিকার এমন আচরণে প্রভাবিত হয়ে শিক্ষার্থী তার ধর্মও গ্রহণ করে বসতে পারে। (প্রাগুক্ত ৫৭)

এই যুক্তিগুলো শুনলে আপনি বুঝতে পারবেন সেক্যুলাররা তাদের চিন্তা ধারা চাপিয়ে দেয়ার ব্যাপারে কত কঠোর।

এটি 'সমতা' নীতির সাথে সবচেয়ে বেশি সাংঘর্ষিক এবং সবচেয়ে স্পষ্টরূপে সমতাকে নাকচ করে।

২- পারিবারিক জীবন

বিবাহ ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বিষয়। কিন্তু সেক্যুলার মূলনীতি বিবাহকে এমনভাবে নিজেদের নিয়মকানুনের অনুগামী করেছে যাতে কোনোভাবে সেক্যুলারিজমের সাথে এর সংঘর্ষ না থাকে। অনেক আগ থেকে সেক্যুলারিজমে এ দ্বন্দ্ব উপস্থিত। প্রাথমিক যুগের সেক্যুলারিজম রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের মাত্রা সংকীর্ণ করে দিয়ে স্বাধীনতার আওতা বৃদ্ধি করেছিল তা সত্ত্বেও তৎকালীন লিবারেল দার্শনিক জন স্টুয়ার্ট মিল (মৃ. ১৮৮৩ খ্রি.) এমন বিবাহে বাধা দেওয়ার পক্ষে ছিলেন যে বিবাহে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের পারিবারিক জীবন গঠনের যাবতীয় উপকরণের অভাব বিদ্যমান। পারিবারিক জীবনে রাষ্ট্রের এমন হস্তক্ষেপের লক্ষ্য হলো, ব্যক্তির কোনো কাজে যেন অন্য কেউ ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। [দেখুন, জন স্টুয়ার্ট মিল, আনিল হুররিয়্যাহ (১৭২-১৭৩)]

এমনই চাপিয়ে দেওয়া কিছু নিয়মের উদাহরণ হলো বিবাহের ক্ষেত্রে শরীয়তের বিভিন্ন শর্ত যেমন- অভিভাবকের অনুমতি, সাক্ষীর উপস্থিতি কিংবা মাহরাম পুরুষদের বিবাহ না করা প্রভৃতিকে নিষিদ্ধ করা; যেহেতু এটি মেয়ের স্বতন্ত্র ইচ্ছার সাথে সাংঘর্ষিক। এখানে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ধারণা অগ্রাধিকার পাবে; কারণ এটি সেক্যুলার মূলনীতির উপর নির্ভর করছে।

ব্যক্তি-স্বাধীনতার কোনো দিক সেক্যুলারিজম এর সাথে মিলে গেলেই সেটি গ্রহণযোগ্য হবে এমনটা নয়, বরং সেটি নিষেধও করা হতে পারে। যেমন-

বিবাহের বয়স নির্ধারণ করা এবং নির্দিষ্ট একটা বয়সের নিচে বিবাহ

নিষিদ্ধ করা যদিও স্বামী-স্ত্রী তাতে সন্তুষ্ট থাকে।

বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করা।

এক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে রাজি থাকলেও সেক্যুলারিজম এগুলোর অনুমতি দিবে না বরং বাধা দিবে, যদিও সেক্যুলার মূলনীতির সাথে এগুলো সাংঘর্ষিক না। এভাবে বোঝা যায় সেক্যুলার মূলনীতিগুলোর প্রভাব কদ্দুর।

৩-ইবাদত

ইবাদত-বন্দেগী দীনের সবচেয়ে সংকীর্ণ একটা বিষয় হওয়া সত্ত্বেও লিবারেলিজম ধর্ম বলতে কেবল ইবাদতকেই বুঝে। লিবারেলিজম ধর্মকে কিছু আনুষ্ঠানিক ইবাদতে সীমাবদ্ধ করে নেওয়ার পরও আনুষ্ঠানিক ইবাদতগুলো সেক্যুলারিজমের শৃঙ্খল ও নিষেধাজ্ঞা থেকে বাঁচতে পারেনি।যথা:

আযান দেওয়ার নিয়ম-নীতি, সালাত কায়েম এবং উচ্চৈঃস্বরে আযানের উপর হস্তক্ষেপ।

শুধু তাই নয়, জুমু'আর খুতবায় যে বিষয় আলোচনা হবে তাতেও আপনার পূর্ণ স্বাধীনতা নেই। বরং লিবারেল মূলনীতির সাথে কোনোক্রমে যেন সাংঘর্ষিক না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। কানাডার টরেন্টোতে একটা মসজিদে জুমু'আর খুতবার শেষে একজন খতীব দোয়া করেছিলেন, 'হে আল্লাহ! আপনি মসজিদুল আকসাকে ইহুদিদের নাপাকি থেকে পবিত্র করুন।' কেবল এ বাক্যের জন্য তাকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়, মসজিদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয় এবং যে বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি কাজ করতেন সেখান থেকেও বরখাস্ত করা হয়।

এর পাশাপাশি দেখা যায়, কিছু কিছু কর্মক্ষেত্রে মুসলিমের জন্য জুমু'আর সালাত আদায় করতে কিংবা ঈদ উদযাপন নিষিদ্ধ।

৪-শিক্ষব্যবস্থা

ধর্মীয় শিক্ষায় হস্তক্ষেপ করে তাতে সংকীর্ণতা আরোপ। সেটি হতে পারে ধর্মীয় শিক্ষাকে পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা অথবা এমন কিছু বিষয় পড়ানোকে বাধ্যতামূলক করে দেওয়ার মাধ্যমে যেগুলো সেক্যুলার মূল্যবোধের অনুগামী। পাশাপাশি অন্য সব বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণে রাখা হবে যেন সেক্যুলার মূল্যবোধের বিপরীতে না যায় বা এর সাথে সাংঘর্ষিক না হয়।

ধর্মের সাথে সাংঘর্ষিক বিষয় পড়ানো আবশ্যক করে দেওয়া এর একটা নমুনা। যেমন- বিবর্তনবাদ তত্ত্ব পড়ানো। এর বাইরে অন্য কোনো তত্ত্ব পড়ানো নিষিদ্ধ করা যদিও তার বৈজ্ঞানিক ভিত শক্তিশালী থাকে। পশ্চিমা বিশ্বে বুদ্ধিদীপ্ত নকশা বা অনুকল্পের তত্ত্বে (Intelligent Design) বিশ্বাসী বিজ্ঞানীরা যে প্রতিপক্ষের দ্বারা সবসময় আক্রমণের স্বীকার হন এবং তাদেরকে শিক্ষণ কার্যক্রম থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয় তা সর্বজনবিদিত। তাদের সাথে এমন আচরণ করা হয় যেন তারা কোনো 'ধর্মে বিশ্বাসী'। অথচ তারা পশ্চিমা বিজ্ঞানের প্রদত্ত উপকরণ ও পদ্ধতি অনুসরণ করেই নিজেদের চিন্তাধারা পেশ করে। ইদানীং সমকামিতার মতো জঘন্য পাপ কেও পাঠ্যবইয়ে সাবলীল ভাবে হালালাইজ করা হচ্ছে।

[রেফারেন্স: আল-মুহারত্বিক (১৮৪-১৮৬)। জোনাথন ওয়েলস, আইকুনাতুত তাম্বাউর (২৬৬-২৯৬)। মাইকেল বীহি, সুন্দুকু দারউইনআল-আসওয়াদ (৩৭৬-৩৭৭), (৩৮২-৩৮৩)। ডগলাসএক্স, গাইরু কাবিল লিত-তাকমীব (৪৮-৫৫), (২১)]

আগে বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া মুসলমান শিক্ষার্থীদের অনেকে এ বলে অনুযোগ করত, দুঃখ করত যে, তাদের কোনো কোনো স্যার প্রকাশ্যেই ইসলাম ও কুরআন-সুন্নাহ নিয়ে বিদ্রূপ, কটাক্ষ করেন। তা ছিল বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া বুঝমান শিক্ষার্থীদের সমস্যা। কিন্তু এখন আর ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ শোনার জন্য আপনাকে কলেজ-ইউনিভার্সিটি যেতে হবে না। কিছুদিন আগেও শিক্ষানীতি শিশু শ্রেণী থেকেই মুসলিম ছেলেমেয়ের সেক্যুলার আদর্শে গড়ে তোলার প্রত্যয় নিয়েছিলো। সেভাবেই তৈরি হয়েছিলো বইপত্র। গত বছর একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য শিক্ষা কারিকুলাম ঠিক করতে গিয়ে জেনারেল বিষয়গুলো সরকারি বোর্ডের বই থেকে পড়ানোর সিদ্ধান্ত হয়। কোমলমতি শিশুদের অঙ্কুর থেকেই শিরকী ভাবধারায় গড়ে তোলার মতো যথেষ্ট উপাদান এই বইগুলোতে রয়েছে।

৫- মত প্রকাশের স্বাধীনতা

ধর্মীয় বিষয়ে আপনার মত প্রকাশের স্বাধীনতায়ও আপনি সেক্যুলার মূলনীতির দ্বারা পরিচালিত। ঘৃণার উৎপাদন করে এমন সব কিছু বলা থেকে আপনি বিরত থাকবেন। কেননা ঘৃণিত যেকোনো বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা নিশ্চিতভাবে বর্জনীয় বিষয়।

বিরোধী পক্ষের যে কোনো মতকে গলা টিপে শেষ করে দেওয়া হয়। আর সেক্যুলারিজমের এমন হস্তক্ষেপের মাত্রা দিন দিন বেড়েই চলেছে।

স্বাধীনতার ক্ষেত্র সীমিত করে দেওয়ার একটা উদাহরণ হলো, ইসলামের প্রতি দাওয়াতের স্বাধীনতাকেও সীমাবদ্ধ করে দেওয়া। এমনকি খ্রিস্টধর্মের প্রতি আহ্বানের স্বাধীনতাও, যেটা অধিকাংশ মানুষের বিশ্বাসের বিপরীতে যায়। কেউ কেউ মনে করতে পারে যে, এটি তো স্বাভাবিকভাবেই স্বাধীনতার অংশ। কিন্তু বিষয়টা এমন নয়, ইউরোপীয় মানবাধিকার আদালত ঘোষণা অন্য কোনো ধর্ম প্রচার করা দণ্ডনীয় অপরাধ। আর এটিকে অপরাধ বলে গণ্য করার পেছনে লক্ষ্য হলো অন্যদের স্বাধীনতা রক্ষা করা।

অনুরূপভাবে পশ্চিমা অনেক সরকার ইহুদিদের সমালোচনা হলোকাস্টের অস্তিত্ব অস্বীকার করাকে অপরাধ বলে গণ্য করে। ইহুদিদের বিষয়ে কেউ নিজের মতামত প্রকাশ করলেই তাকে এন্টি-সেমেটিজমের দায়ে অভিযুক্ত করে।

৬- আত্মপরিচালনার স্বাধীনতা

আরো যে বিষয়টি সমস্যার উদ্রেক করে সেটি হলো বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠনগুলোর অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলো পরিচালনার স্বাধীনতা, যে পরিচালনার কাজ সমাজে কোনো প্রকার ক্ষতি বয়ে আনে না। বিষয়টি যখন তাদের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকে, অন্যদের জীবন পর্যন্ত ছড়িয়ে যায় না। ব্যক্তি-স্বাধীনতার সাথে নির্দিষ্ট থাকে, জনসাধারণের কোনো ক্ষতি করে না। কথাঠনের ভেতর যিনি আছেন, তাকে ভাবারণের কোনো বাকতি করে না। হয়। তবে এটি এমন দাবি যা সহজে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়।

সেক্যুলারিজমের দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টা সহজেই বোধগম্য হবে, যখন আপনি এমন কাউকে বাধা দিবেন যে কিনা তার জীবনযাপনের পদ্ধতি অন্যদের উপর জোর করে চাপিয়ে দিতে চাইবে। কিন্তু যে ব্যক্তি নিজের রক্ষণশীল মূলনীতি অনুযায়ী জীবনযাপন করতে চায়, সেক্যুলারিজমকে তার কোনো বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ দিতে চায় না। ধর্মীয় সংগঠনগুলোর অভ্যন্তরেও নির্দিষ্ট বিশেষ শর্তাবলি অনুযায়ী পারস্পরিক চুক্তিবদ্ধ হওয়ার স্বাধীনতা নেই, যদি সেগুলো সেক্যুলার মূলনীতিতে ফাটল ধরায়।

বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক সংগঠনগুলোও সেক্যুলার মূলনীতির বাইরে যেয়ে পারে না।

৭- রাজনীতিতে অংশগ্রহণ

রাজনীতিতে অংশগ্রহণের অধিকার সবার। কে কোন চিন্তার বা ঘরানার সেটি বিবেচ্য বিষয় নয়। কিন্তু সেক্যুলার মূলনীতিগুলো মেনে চললে যেসব মানুষ সেসব মূলনীতিগুলোর সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে না তাদের উপর নানাবিধ শর্ত চাপিয়ে দেওয়া হয়। ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে যে, বিরোধিতা সরাসরি হওয়া জরুরী নয়। দূরতম বিরোধিতা থাকলেও কোনো প্রকার অনুগ্রহ দেখানো হয় না।

[মাদখাল ইলাল ফালসাফাতিস সিয়াসিয়্যাতিল মুয়াসিরাহ

(২৯৩-২৯৪)।]

৮-খাদ্য

খাবারের ক্ষেত্রে আপনি শরয়ী যবেহ করতে পারবেন না, যেটা পশুদের অধিকারের সাথে সাংঘর্ষিক। যেটা নিয়ে কুরবানীর সময় হরহামেশাই কথা শোনা যায়।

৯- পোশাক ও বাহ্যিক অবয়ব

নারীকে হিজাব পরতে নিষেধ করা হবে, যেমনিভাবে পুরুষকেও কিছু কিছু কাজের ক্ষেত্রে দাড়ি লম্বা করতে নিষেধ করা হবে।

হিজাবের বিরুদ্ধে অবস্থান করাটা বিশ্বাসগত বিষয়। কেননা হিজাবকে পুরুষবাদ মনে করা হয়। নারীর উপর কর্তৃত্ব খাটানোর উপকরণ বলে গণ্য করা হয়। সুতরাং এটি অকারণে নিষেধ করা নয়, বরং আকীদা-বিশ্বাসের সাথে জড়িত হওয়ায় এটিকে নিষিদ্ধ করা হয়।

লক্ষণীয় বিষয় হলো, সেক্যুলাররা এটির ব্যাপারে অতিরিক্ত কঠোর; যদিও এর প্রতি তাদের প্রয়োজন সামান্য। যেসব বিষয়কে সেক্যুলার বিশ্বাসের সাথে তারা সাংঘর্ষিক মনে করে, সেগুলোর ব্যাপারে তারা কঠোর অবস্থান নেয়, যদিও সমাজে সেসব বিষয়ের উপস্থিতি কম থাকে। ফ্রান্সে মুসলিম নারীদের হিজাব পরার বিষয়টি সমগ্র ফ্রান্সের রাজনীতিকে ব্যস্ত রাখে। পুরো বিশ্বে এ ব্যাপারে জনমত তৈরি হয়। অথচ এর সংখ্যা সারা ফ্রান্স জুড়ে এক হাজার পাঁচশ'র কম।

জুমু'আর দিন ফ্রান্সের মসজিদে জায়গা না হওয়ায় রাস্তায় সালাত আদায় করার বিষয়টি নিয়ে ফ্রান্সে অনেক বিতর্কের সৃষ্টি হয়। এমন বিতর্ক আর হট্টগোল থেকে অনেক ফরাসি মনে করতে শুরু করে যে, হয়তো এ রকম রাস্তার সংখ্যা ১৮৫-র মতো। অথচ মাত্র দশটা মসজিদের ক্ষেত্রে এমন ঘটনা ঘটেছে।

১০- জীবনের অধিকার

জীবনের অধিকার নামক যে বিষয়টি দীনের অকাট্য বিষয় হিসেবে গণ্য, সেটিও গর্ভপাতের বৈধতা কিংবা নারীর অধিকার রক্ষার্থে শিশু হত্যা করার মতো সেক্যুলারিজমের আবশ্যকীয় চাপিয়ে দেওয়া বস্তু মেনে নিতে বাধ্য হয়।

[রেফারেন্স: আল-আলমানিয়্যা ওয়া-সিয়াসাতুদ দাউলা তুজাহাদ্দীন (১৬৫)। ইউরোপের মানবাধিকার (আদালতের মতে এর সংখ্যা এক হাজার নয়শ'। দেখুন, মুহাম্মাদ আল-মাইদানী, নামাযিজ মিন আহকামিল মাহকামাতিল উরুব্বিয়্যাহ লি-হুকুকিল ইনসান (৪৩)]

সেকুলারিজমকে কি পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ করা যাবে? সেকুলারিজমের সাথে আপস: দুটির তুলনা

আমরা যখন ইসলামিকৃত এ সকল চিন্তার মাঝে সেক্যুলারিজমের সাথে আপসের দিকগুলো তুলে ধরছি এবং কীভাবে সেক্যুলার চিন্তার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য শরীয়তের বিভিন্ন বিষয়ের অপব্যাখ্যা করা হয় তা বর্ণনা করছি, তখন আমাদের করণীয় হলো ইনসাফের সাথে উপস্থাপন করা যে, পরিপূর্ণরূপে সেক্যুলারিজম গ্রহণ করার চাইতে এটি অল্প ক্ষতির। সুতরাং কখনো এটি বলা সমীচীন নয় যে, আপসকামীদের ক্ষতি সেক্যুলারিজমের ক্ষতির চেয়ে বেশি।

প্রথমত, যে মানুষ ওহীকে উৎস হিসেবে মানে এবং মৌলিক ভাবে ওহীর উপর আত্মসমর্পণ করে সে ঐ মানুষের সমান নয় যে ওহী থেকে বিমুখ।

দ্বিতীয়ত, যে ভুল ব্যাখ্যা দেয় সে স্পষ্টত শরীয়তকে প্রত্যাখ্যান করে আর এটা পূর্নাঙ্গ বিমুখ হবার মতো নয়। যে শরীয়তের কিছু বিধান ত্যাগ করে সে ঐ ব্যক্তির সমান নয় যে শরীয়তকে পরোয়াই করে না।

তৃতীয়ত, যে-সকল শরয়ী বিধি-বিধান সেকুলারিজমের সাথে সাংঘর্ষিক নয়, সেগুলোর ব্যাপারে উভয় পক্ষের অবস্থান ভিন্ন। যারা শরয়ী বিধি- প্রধানের ভুল ব্যাখ্যা করে, তারা রাষ্ট্র পরিচালনার আইনগুলোর ক্ষেত্রে সেক্যুলারিজমের সাথে আপস করে নিলেও বাকি শরয়ী বিধানগুলো তাদের কাছে অপরিবর্তিত। অন্যদিকে যারা শরীয়ত প্রত্যাখ্যান করে, তারা সকল বিধি-বিধানের এবং

শরয়ী নিদর্শনসমূহের বিরোধিতা করে। তবে নিরপেক্ষ সেক্যুলার হলে হয়তো আক্রমণ করে না।

চতুর্থত, যেগুলোতে সেক্যুলাররা ধর্মকে কোনো সুযোগ দিতে চায় না। যেমন- জনশৃঙ্খলা বা জননৈতিকতা, যেগুলো না মানলে জনসাধারণ ক্ষতির সম্মুখীন হবে। যেহেতু শরীয়তের ভুল ব্যাখ্যাকারীরা দীনের প্রতি সম্মান রাখে এবং দীনের মূলনীতিসমূহ অনুসরণ করতে চায়, সেহেতু তারা শরয়ী মূলনীতিসমূহকে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায় অন্তর্ভুক্ত করে পালনের চেষ্টা করে। আর এটি ধর্মের প্রতি তাদের সম্মানের একটা নমুনা।

পঞ্চমত, ভুল ব্যাখ্যারও স্তরবিন্যাস আছে। কিছু ভুলের মাত্রা অন্য ভুল থেকে বেশি। প্রত্যেক চিন্তায় ভুলের পরিমাণ কতটুকু সেটি না জেনে সবগুলো এক স্তরে রাখা ঠিক হবে না। কারণ ভুলটা সরাসরি মতের মাঝে না থেকে গৃহীত মতের আবশ্যকীয় ফলাফলে থাকতে পারে। হয়তো বক্তব্য দেওয়ার মাধ্যমে সেক্যুলারিজমের সাথে মিলে যাওয়া হচ্ছে না, কিন্তু বক্তব্যের আবশ্যকীয় পরিণতি হিসেবে সেক্যুলারিজমকে মেনে নেওয়া হতে পারে। কোনো কথার ফলাফল যদি ভুল হয়, তাহলে সে কথাটাও ভুল। তবে ফলাফলকে ব্যক্তির দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা যাবে না, কারণ ব্যক্তির কথার আবশ্যকীয় ফলাফল তার কথা নয়।

সেক্যুলারিজমের কতটা কাছে বা দূরে, সেটির উপর ভিত্তি করেই সেক্যুলারিজমের সাথে কতটা মিলে বা মিলে না তা বিশ্লেষণ করতে হবে।

এই স্তরভেদ থাকার কারণে সেক্যুলার কোনো বক্তব্যের সাথে মিলে যাওয়া সবাইকে একটা মতের অনুসারী বলা যথাযথ হবে না। ইনসাফের
দাবি এমনটাই। আমরা একটা পরিস্থিতি বা অবস্থা হিসেবে বিষয়টিকে পাঠ করব। ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর উপর ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করব না।

ষষ্ঠত, বর্তমান যুগের পরিবর্তিত বিষয়গুলোর দিকে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে, বহু দেশেই শরয়ী বিধি-বিধান বাস্তবায়ন করা সম্ভব না। পরিবর্তিত নানা পরিস্থিতির জন্য শরীয়তের যথাযথ নির্দেশনা অনুযায়ী উপযুক্ত ইজতিহাদ করা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ভুল ব্যাখ্যাকারী ভুলবশত পরিস্থিতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে দ্বীন বিকৃত করেছে। সে এমন বাস্তবতার সম্মুখীন হয়ে ভুল করেনি, যে বাস্তবতা খুবই সহজ।

তবে তার মানে এই না যে, তাদের কাজকে বৈধতা দেওয়া হচ্ছে বা হালকভাবে নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু তাদের অবস্থা ঐ সকল মানুষের সাথে তুলনা করা হচ্ছে, যারা পুরোপুরি সেক্যুলারিজমের অনুসরণ করছে।

এ সকল কারণে ইসলামীকৃত বিভিন্ন চিন্তার খন্ডনের সময় ইনসাফ বজায় রাখা জরুরি। কখনো ভাবা যাবে না যে, এগুলো স্বয়ং সেক্যুলারিজম থেকে ভয়াবহ। সেক্যুলারিজমের অনুসারীদের তুলনায় এদের প্রতি অবস্থান আরো কঠোর হওয়া যাবে না। এটি ইনসাফ নয়, শরীয়তের মাপকাঠিও এমন নয়।

পার্থক্য যদি থেকেই থাকে, তাহলে কীভাবে এই ধারণা সৃষ্টি হলো যে এ সকল 'ইসলামিকৃত' চিন্তাগুলো প্রকাশ্য সেকুলারিজম থেকে ভয়াবহ?

সম্ভবত এর কারণ এদের চিন্তায় থাকা বিভ্রাট। সেকুলারিজম ধর্মের উপর নির্ভর করে না। সুতরাং এর ভুল সকলের কাছে স্পষ্ট। বিপরীতে ইসলামিকৃত বিভিন্ন চিন্তা মানুষকে বিভ্রান্তির মাঝে ফেলে দেয়। হক-বাতিলের মাঝে মিশ্রণ ঘটিয়ে দেয়। এমন অস্পষ্টতা থাকায় মুসলিমরা তা গ্রহণ করে নেয়।

এটি আসলেই ক্ষতিকর। এর প্রভাব স্পষ্ট। তাই এই চিন্তাগুলোর মাঝে কী কী সমস্যা আছে তা নির্ণয় করা এবং বাতিল সেকুলারিজম থেকে কোন ধরনের প্রভাব এতে ঢুকে পড়েছে তা উদ্ঘাটন করা জরুরী হয়ে পড়েছে।

এত সমস্যা থাকার পরেও এটিকে কখনো প্রকাশ্য সেক্যুলারিজম থেকে ভয়াবহ বলা যাবে না। আমরা এর ভয়াবহতা যতই বেশি বলি না কেন তা প্রকাশ্য ও স্পষ্ট সেক্যুলারিজম থেকে কম ক্ষতিকর, যেটা মুসলিমদেরকে দীন থেকে বিচ্যুত করে দেয়। স্পষ্ট সেক্যুলারিজম যে ক্ষতি করে তা সেক্যুলারিজম দ্বারা কিছু বিষয়ে প্রভাবিত হওয়া থেকে বেশি ভয়াবহ। কেননা এটি পুরোপুরি দীন থেকে বের করে দেয়, দীনের ব্যাপারে সংশয়ে ফেলে দেয় এবং দীনের সাথে সাংঘর্ষিক সকল কিছুকে শক্তভাবে প্রতিষ্ঠা করে।

বিভিন্ন চিন্তা-ধারণার মাঝে তুলনা করার সময় উক্ত চিন্তাগুলোতে নিহিত বিভ্রান্তির মাত্রা অনুযায়ী বিবেচনা না করে অস্পষ্টতার মাত্রা অনুযায়ী বিবেচনা করা যথাযথ নয়। এমনটা করা হলে একজন ভুল ব্যাখ্যাকারী আলেমের পদস্খলন ঘটলে তাকে কাফের-নাস্তিকদের চাইতেও বেশি বিভ্রান্ত বলে গণ্য করা হবে। কারণ কাফের-নাস্তিকের বিভ্রান্তি স্পষ্ট, আর আলেমের বিভ্রান্তি অস্পষ্ট। এভাবে বিবেচনা করার অর্থ হলো, ইন্যসাফ পরিত্যাগ করা।

সবকিছুতে ধর্ম টেনে আনবেন না

এ বাক্যটি হরহামেশা শোনা যায়,যারা আমরা আল্লাহর দ্বীন মেনে চলার জন্য যুদ্ধ করি।

যারা কুরআনের কথা, আল্লাহর কথা, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথাকে পৌঁছানোর কাজটা করত, আমাদের মাঝে নবির দায়িত্ব পালন করত, তাদেরকে 'মোল্লা, মৌলভি, হুজুর' লকব দিয়ে তাচ্ছিল্য করেছি, অচ্ছুৎ অবমানব হিসেবে মার্জিনালাইজ করেছি। যেন তাদের কথাকে পাত্তা দিতে না হয়। তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়া যায়।

বলেন, আমার জীবনে এমন কে আছে যে আমাকে আল্লাহর কথা পৌঁছাবে? জরুরি মনে করিনি, তোয়াক্কা করিনি। এমন কার সাথে আমি সম্পর্ক রেখেছি যে আমাকে আল্লাহর কথা শোনাবে? 'সেই উত্তম সঙ্গী যাকে দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়, যার কাজে আখিরাতের স্মরণ আসে।' [১]

আল্লাহ দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞান হাসিলকে আপনার ওপর ফরজ করেছেন। আলিমদের জন্য আপনার কাছে গিয়ে আপনাকে শেখানো ফরজ নয়। ফিকহে আছে, শরিয়তের যেসব বিধান সচেতন মুসলিম সমাজের কাছে প্রসিদ্ধ কিংবা যেখানে সহনীয় দূরত্বের মধ্যে মাসআলা জিজ্ঞেস করার মতো একজন আলিম আছেন, সেখানে 'না জানার অজুহাত' বাতিল হয়ে যায়। ওই বাসিন্দাদের 'না জানার অজুহাত' বাতিল হয়ে যায়।কারণ বাসার পাশে মসজিদ আছে, পাশের মহল্লার মাদরাসা আছে।সেখান থেকে জানার উপায় আছে।

কেউ যখন আল্লাহর কথা মনে করিয়ে দিয়েছে 'ভাই, কুরআনে নিষেধ আছে', 'ভাই, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো নিষেধ করেছেন।' আমরা কী বলেছি? আমরা বলেছি- 'সবকিছুতে ধর্ম টেনে আনবেন না।' মানে কী? মানে সবখানে আল্লাহ-নবির কথা শোনাবেন না। সবখানে আল্লাহ-নবির জায়গা নেই। সবখানে জায়গা নেই, নাকি আমার কাছে জায়গা নেই? আমি শুনতে চাই না, এ ব্যাপারে আল্লাহ কী বলেছেন। কী প্রমাণ করতে চাই আমি এ কথা বলে?

সেক্যুলারদের এ কথাগুলো তথাকথিত মুসলিমদের থেকে শোনা যায়।

রেফারেন্স:

[১] সেই তো উত্তম সঙ্গী, যাকে দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়, যার কথা শুনলে আমলের উৎসাহ বৃদ্ধি পায় এবং যার কাজে আখিরাতের স্মরণ আসে। [মুসনাদু আবি ইয়ালা: ২৪৩৭; শুআবুল ঈমান। ৯০০০; আল-আওসিয়া, ইবনু আবিদ দুনইয়া: ২৫; আত-তারগিব ফি ফাজাইলিল আমাল: ৪৮২২ আল-মুনতাখাব মিন আবদ বিন হুমাইদ: ৬৩১; আল-মাতালিবুল আলিয়া: ২৮১৭, ৩২৪৬। হাদিসটির সনদ সামান্য দুর্বল।]

সেক্যুলারিজম কি কোরআন সুন্নাহ সমর্থন করতে পারে?

এ কথা বলা কি ঠিক যে, ইসলামে সেক্যুলারিজম আছে? না, এ কথা কোনোদিনই বলা যাবে না। এ কথা ঠিক নয়, হতে পারে না। ধর্মহীনতা কী করে ইসলামসম্মত হতে পারে। এমন বিষয় যার সাথে ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার কোনোই সম্পর্ক নেই, এটি কেমন করে ইসলাম সমর্থন করতে পারে। একজন মুসলমান কেমন করে এ মতবাদ গ্রহণ করতে পারে? মুসলমানের জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই সেক্যুলারিজম স্থান পেতে পারে না।

আংশিক বা পূর্ণ ইসলাম ত্যাগ করার কোনো সুযোগ নেই। ধর্মকে একান্ত ব্যক্তিগত বিষয় বানিয়ে রাখার অধিকারও নেই। ইসলামের পাশাপাশি অপর কোনো ধর্ম বা জীবনব্যবস্থা গ্রহণ করারও উপায় নেই। জীবনের কোনো ক্ষেত্রে কোনো পর্যায়ে ধর্মহীন হওয়ার অবকাশও নাই। মুসলমানদের কেবল মুসলমান হতে হবে, সেক্যুলার মুসলমান হওয়ার কোনো ব্যবস্থা নেই।

ব্যক্তি মুসলিমের জীবনে, মুসলিম পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে অপরাপর ধর্মাবলম্বীদের সামাজিক এবং মানবিক আচরণ কেমন হবে। অন্যদের নাগরিক নিরাপত্তা ও ধর্ম পালনের অধিকার কতটুকু সুরক্ষিত থাকবে, এ প্রশ্ন যখন ওঠে তখন অনেকে এক্ষেত্রে ইসলামের আচরিত রীতি পদ্ধতি ও সম্প্রীতির কালচারকে ইসলামের নীতি আদর্শ বা সৌন্দর্য না বলে একে সেক্যুলারিজম আখ্যা দিয়ে ফেলেন। যা মারাত্মক ভুল এবং ইসলামের প্রতি অবিচার।ইসলামের পরমত সহিষ্ণুতা, নাগরিকদের নিজ নিজ ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অধিকার প্রদান, শাসন সুবিচার এবং মানবাধিকারের ক্ষেত্রে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেকের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিতকরণ দুনিয়াতে নজিরবিহীন শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার। এসব বিষয় কোরআন ও সুন্নায় আছে।

ইসলামের ১৩শ' বছরের বিশ্বনেতৃত্বের ইতিহাস সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অপূর্ব দৃষ্টান্ত। একে ইসলামের ন্যায়ভিত্তিক আদর্শ না বলে এর নাম সেক্যুলারিজম দেওয়া বিশাল বড় এক ভুল ছাড়া আর কিছুই নয়।

একটি সাধারণ রাষ্ট্রেও সব ধর্মের মানুষের সমান নাগরিক অধিকার এবং নিজ নিজ ধর্ম পালনের সুযোগ দেয়ার নাম আর যাই হোক সেক্যুলারিজম হতে পারে না। তরজমা হিসাবে ধর্মহীনতা বলে চালানো না গেলে একই অর্থে ধর্মনিরপেক্ষতা বলাও সঠিক কাজ না। এটিকে বরং 'নাগরিকদের ধর্মীয় অধিকার', 'ধর্ম পালনে সবার স্বাধীনতা' বলা কর্তব্য ও অধিক যুক্তিযুক্ত।

কেননা, সেক্যুলারিজমে ধর্মহীনতা স্পষ্ট। যে মতবাদের সাথে ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার কোনোই সম্পর্ক নেই, সেটি কেমন করে, সব ধর্মের অধিকার নিশ্চিত করবে? এটিতো রাষ্ট্রের নাগরিককদের ধর্মহীন ধর্মবিমুখ এবং ধর্মদ্রোহী বানাবে। ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার সাথে যার কোনোরূপ সম্পর্ক নেই সে মতবাদ নাগরিকদের নিজ নিজ ধর্মপালনের সমান অধিকার কী করে দেবে? অতএব, ধর্মকে যারা স্বীকার করে তাদের এ মতবাদের দ্বারস্থ হওয়া উচিত হবে না। তাদের এ নাম ও পরিভাষাটি এড়িয়ে যাওয়া কর্তব্য। তাদের বলা উচিত, সব ধর্মের নাগরিকদের ধর্মীয় অনধিকার সংরক্ষণ।

সেক্যুলারিজম গন্তব্যের কথা বলে না

সেক্যুলারিজম সব সময় মাধ্যমের কথা বলে, কিন্তু গন্তব্যের কথা বলে না। সেক্যুলারিজম মানুষকে গন্তব্যের কথা ভুলিয়ে রাখতে চায়। কারণ, গন্তব্যের আলোচনা করতে হলে ধর্মকে লাগবে। সেক্যুলারিজম আপনাকে কোনো কাজের গুরুত্বের কথা বলবে, কিন্তু কাজের ফলাফলের ব্যাপারে বলবে না। অস্পষ্ট কিছু দাবি ছাড়া আর কিছু তার কাছ থেকে পাওয়া যাবে না। কারণ, ফলাফলের আলোচনা করতে হলে ধর্মের কাছে যেতে হবে।

সেক্যুলারিজম আপনাকে ভোট দিতে বলবে। কিন্তু কোনো নৈতিকতা আর মূল্যবোধের ভিত্তিতে ভোট দিতে হবে, সেটা বলবে না। কারণ, সেটা ধর্মের জায়গা। সেক্যুলারিজম বলবে সবাইকে সমানভাবে সম্মান করতে। কিন্তু সম্মানযোগ্য হবার অর্থ কী, সেটা বলবে না। কারণ, সম্মান ও মর্যাদার কেন্দ্রকে বুঝতে হলে ধর্মের কাছে যেতে হবে।

অনেকে ভাবতে পারেন এর অর্থ হলো মানুষ যত সেক্যুলার হবে তত নিরপেক্ষ হবে। এটা ভুল ধারণা। মানুষের মন-মস্তিষ্ক কখনো খালি থাকে না। লিবারেল সেক্যুলারিজম যে শূন্যতা তৈরি করে কিছু না কিছু দিয়ে সেটা পূর্ণ হয়ে যায়। আমাদের ক্ষেত্রে আজ এই শূন্যস্থান পূরণ হচ্ছে বহুজাগতিক কর্পোরেশান আর অশ্লীলতা ও বিকৃতির প্রচারে সদাপ্রস্তুত।

মুনাফালোভী মিডিয়ার বানানো চটুল সাংস্কৃতিক আবর্জনা দিয়ে। একসময় এটাই হয়ে দাড়াচ্ছে জনগণের ধর্ম। মানুষের পরিচয় আর চরিত্রের কাঠামো। এটাই সেক্যুলারিজমের অবধারিত ফল এবং উদ্দেশ্য। এভাবে সেক্যুলারিজম মানুষকে পরিণত করে ক্ষমতার অনুগত গোলামে। এই বিষের প্রতিষেধক কী?

ইন্নামাল আমালু বিননিয়্যাতি

প্রতিষেধক হলো প্রতিনিয়ত নিজের কাজগুলোকে নিজের অস্তিত্বের উদ্দেশ্যের সাথে যুক্ত করা। নিজের গন্তব্য এবং পরিণতির প্রশ্নগুলো নিয়ে চিন্তা করা। আর এ প্রশ্নগুলোর উত্তর কেবল তিনিই দিতে পারেন যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন। মহান রব্বুল আলামীন। তাই নিজের হৃদয় খুঁড়ে খুঁড়ে ভোগবাদী লিবারেল-সেক্যুলার সংস্কৃতির আবর্জনাগুলো দূর করুন। আর নিজেকে যুক্ত করুন চিরন্তন সত্য পথের সাথে।

আপনি পুরো কুরআন মজীদ, বিশেষ করে মাদানী সূরাগুলো মনোযোগ দিয়ে অর্থসহ পড়ুন এবং লক্ষ্য করুন তাতে নামায, রোযা, হজ্ব ইত্যাদির বাইরে অন্যান্য বিষয়ের আরো কত

আয়াত রয়েছে। হাদীসগ্রন্থগুলোতে ইবাদাত অধ্যায়গুলোর তুলনায় পরিবারনীতি, সমাজনীতি, বিচারনীতি, লেনদেন পদ্ধতি, কৃষি-সেচ ইত্যাদি অধ্যায়গুলোর হাদীস সংখ্যার তুলনামূলক হিসাব করুন তাহলে দেখবেন দ্বিতীয় অংশের হাদীসের সংখ্যা কত বেশি। সেক্যুলারিজম মানতে হলে আপনাকে ঐসব কিছুই এখন রহিত হয়ে গেছে-ঘোষণা করতে হবে। (নাউযুবিল্লাহ)

অস্তিত্বহীন সেক্যুলারিজম

যে ব্যক্তি ইসলামী নীতিমালা ও আদর্শে বিশ্বাসী তাকে যদি কোনো সেক্যুলার রাষ্ট্রের বিচারক বা কাযী নিযুক্ত করা হয় তার ধর্ম কি তাকে শরীয়তের বাইরে গিয়ে কোনো বিচার করার সুযোগ দিবে? তখন তো তিনি অসংখ্য আয়াত ও হাদীসের জেরার মুখে পড়বেন। তিনি কি বলতে পারবেন যে, এই আয়াত ঐ সন পর্যন্ত, ঐ প্রজন্মের জন্য ছিল? এ রকম করলে সবই ছেড়ে দিতে হবে। ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রনায়কের একটি অপরিহার্য দায়িত্ব হল হুদূদ-কিসাস কার্যকর করা। এক্ষেত্রে রাষ্ট্র সেক্যুলার হওয়ার কারণে তাকে কিতাবুল হুদূদের হাদীসগুলোতে, সূরা নূরের আয়াতসমূহে টীকা লাগিয়ে দিতে হবে যে, এগুলো প্রথম যুগের সাথে সম্পৃক্ত। পরবর্তীদের জন্য তা প্রযোজ্য নয়। তাই সেক্যুলারিজম নিয়ে বিভ্রান্তিতে পড়ার কোনো সুযোগ নেই। দৃঢ়তার সাথে বুঝতে হবে যে, এটা সম্পূর্ণ লা দ্বীনী ও Anti Islam নীতি।

বিখ্যাত মুহাদ্দিস আবু যুরআ রাহ.কে খলীফা ওলিদ ইবনে আবদুল মালিক জিজ্ঞাসা করেছিল যে, أيحاسب الخليفة খলীফারা যে রাষ্ট্র পরিচালনা করে তাদের কি হিসাব দিতে হবে? পাকড়াও হবে?

আবু যুরআ রাহ. বলেছিলেন, অবশ্যই হিসাব নেওয়া হবে এবং দলিল হিসেবে তিনি কুরআন মজীদের এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন-

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

অর্থ : হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি, অতএব তুমি লোকদের মধ্যে সুবিচার কর এবং খেয়ালখুশির অনুসরণ করো না। কেননা এটি তোমাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করবে। যারা আল্লাহর পথ হতে ভ্রষ্ট হয় তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। কারণ তারা বিচারদিবসকে বিস্মৃত হয়ে আছে।
(সূরা ছোয়াদ: ২৬)

ইবনে কাসীর রাহ. এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ঠিক একই কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন-
هذه وصية من الله عز وجل لولاة الأمور أن يحكموا بين الناس بالعدل

অর্থ: এটা আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে শাসকদের প্রতি নির্দেশনা যে, তারা যেন লোকদের মধ্যে সুবিচার করে।

বিচার একমাত্র আল্লাহর আইনেই (ইসলামী শরীয়াহ? হওয়া বাধ্যতামূলক। ধর্মনিরপেক্ষতা বা নিরপেক্ষ ভাব-ভঙ্গি বলতে কিছু নেই।

সূরা আল-মায়েদা (৫:88)
عَلَيْهِمْ إِسْمًا ۚ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا
وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ
وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

অর্থ:
"আর যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী বিচার করে না, তারাই কাফের।”

যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী বিচার করে না তাদেরকে কাফের সাব্যস্ত করা হয়েছে।

মুসলিমদের দাওয়াহ এবং কর্মকাণ্ড কি শুধু "ধর্মীয়" বিষয়গুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে?

সেক্যুলারিজমে ধর্মের অবস্থান ব্যক্তিগত অঙ্গনে সীমাবদ্ধ। সমাজ, শাসন, অর্থনীতির মতো সামষ্টিক বিষয়গুলোকে ধর্মের আওতার বাইরে রাখা সেক্যুলারিজমের অন্যতম মৌলিক অবস্থান। সেক্যুলার চিন্তায় "ধর্মীয়" মানেই মাসজিদ, ঘর আর সীমিত কিছু আচারপ্রথার বিষয়।

কিন্তু এই কথাগুলো ইসলামের ক্ষেত্রে খাটে না। ইসলাম আমাদের শেখায় মানবজীবনের সব ক্ষেত্রকে ওয়াহীর নির্দেশনা অনুযায়ী চালাতে। আর এর মধ্যে অবধারিতভাবেই শাসন, অর্থব্যবস্থা আর সামাজিক কাঠামোর মত বিষয়গুলো চলে আসে।

ইসলাম তাত্ত্বিকতার ধর্ম না, প্রয়োগের ধর্ম। স্রেফ তাত্ত্বিকভাবে একে বোঝা যায় না। এই দ্বীনের সৌন্দর্যকে সত্যিকারভাবে বুঝতে হলে দ্বীন আকড়ে ধরে বাঁচতে হয়। আধুনিকতা থেকে বের হয়ে আসা অর্থনীতি কিংবা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মত তাত্ত্বিক শাস্ত্র তাই ইসলামে পাওয়া যায় না। তত্ত্বকথা, কাল্পনিক মডেল আর বাদ-মতবাদের বিশাল বিমূর্ত অট্টালিকা ইসলাম তৈরি করে না। কিন্তু তার মানে এই না যে এ বিষয়গুলোর ব্যাপারে আলোচনা বা নির্দেশনা ইসলামে নেই।

এই ক্ষেত্রগুলোর ব্যাপারে ইসলামী শরীয়াহ আমাদের কিছু নির্দিষ্ট বিধান এবং সীমানা ঠিক করে দেয়। জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গনগুলোর ব্যাপারে দেখিয়ে দেয় সমাধানের নানা পথ। ইসলাম আমাদের এমন কিছু মূলনীতি দেয় পরিবর্তনশীল বাস্তবতাকে আমলে নিয়ে যেগুলো বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে প্রয়োগ করা সম্ভব।

শরীয়াহ বাস্তবায়নের বিধান

এ বিষয়ে কোনো মতভেদের অবকাশ নেই যে, একজন মুসলিমের জন্য তার সাধ্যমত শরীয়ত বাস্তবায়ন করা আবশ্যক। সুতরাং পূর্বে যত কিছু উল্লেখ করা হয়েছে তা সবই আদর্শ ও পূর্ণাঙ্গ রূপের বিবরণ। কিন্তু সেটি শরীয়াহ বাস্তবায়নের আবশ্যকতার উপর প্রভাব ফেলে না। কেননা মানুষের দায়িত্ব হলো সাধ্যমত শরীয়াহ বাস্তবায়ন করা।)فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْ("সুতরাং তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় কর।" [সূরা আত-তাগাবুন: ১৬]

এই বিষয়টি কোনোভাবে শরীয়ত বাস্তবায়নের আবশ্যকতার বিধানের উপর প্রভাব ফেলবে না। কারণ শরীয়ত বাস্তবায়নের কিছু শর্ত ও সীমারেখা আছে। কিছু বিধান বাস্তবায়ন করা কঠিন হওয়ার কারণে শরীয়ত বাস্তবায়নের বিধান বাতিল হয়ে যাবে না। বরং সাধ্যমত শরীয়াহর যতটুকু বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় ততটুকুই করতে হবে। আর সে অবস্থায় আবশ্যকতার মাত্রাও তেমনই।

যখন কোনো প্রয়োজন বা জরুরত দেখা দেয়, তখন শরীয়াহ বাস্তবায়ন বলতে বোঝায় উদ্ভূত পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য বিধান করা।

শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার মূল একমাত্র ইসলামী শরীয়াহ, সেক্যুলারিজম নয় কেন?

নিঃসন্দেহে ইসলামে শান্তি ও নিরাপত্তা রয়েছে। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে শান্তি ও নিরাপত্তা তা-ই, যা শরিয়ত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অর্জিত হয়। মূলত শান্তি ও নিরাপত্তার ইউনিভার্সাল কোনো কনসেপশন নেই। প্রতিটি জীবনব্যবস্থা একটি নির্দিষ্ট কনসেপ্টের শান্তি ও নিরাপত্তার দাবি করে। এর কারণ হলো অধিকারের ব্যাখ্যার ভিন্নতা। শান্তি কিংবা নিরাপত্তার মানে হলো, কোনো জীবনব্যবস্থা ব্যক্তির জন্য যেসব অধিকারের স্বীকৃতি দেয়, তা সংরক্ষণ করা। যেমন, ইসলাম সমকামিতাকে ব্যক্তির অধিকার মনে করে না, তাই ব্যক্তিকে এই কর্মের অনুমোদনও দেয় না। এই কাজে তার জন্য ইসলাম শান্তি ও নিরাপত্তা প্রদান করে না। কিন্তু পাশ্চাত্য সমাজ যারা সেক্যুলারিজম চিন্তাধারণ করে তারা সমকামিতাকে ব্যক্তির অধিকার মনে করে, তাই এ ক্ষেত্রে ব্যক্তির পরিপূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তা দাবি করে এই সভ্যতা। পাশ্চাত্যের শান্তির কনসেপ্ট বুঝার জন্য নোবেল পুরস্কার আমাদের সামনে এক স্পষ্ট উদাহরণ। এই পর্যন্ত তাদেরকেই নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে, যারা কোনো না কোনোভাবে ইসলাম ও মুসলিমদের ক্ষতি

করেছে কিংবা পাশ্চাত্যের চিন্তা ও দর্শনের উপকার করেছে। এজন্য কোনো মুসলমানের জন্য বৈধ নয়, সে কাফেরদের এই পুরস্কার নিয়ে গর্ব করবে, ফ্যান্টাসিতে ভুগবে এবং একে ভালো চোখে দেখবে।

এই মৌলিক পার্থক্য না বুঝার কারণে অনেক মুসলিম চিন্তাবিদ শান্তি ও নিরাপত্তাকে ইউনিভার্সাল মনে করে। এর সবচেয়ে বাজে দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই মাকাসিদে শরিয়াহর অধ্যায়ে। ইসলামের দৃষ্টিতে শান্তির উদ্দেশ্য কেবল জান-মালের নিরাপত্তা নয়। একজন ব্যক্তি তার সন্তানকে জিনা থেকে, পাপাচার থেকে, সমাজে প্রচলিত নানা অপরাধ থেকে বাঁচাতে পারছে কি না ইসলামে এটাও নিরাপত্তার অংশ।

শায়খ আব্দুল আযীয ইবন বায রাহিমাহুল্লাহ বলেন: "ইসলাম বিনষ্টকারী চতুর্থ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত ঐ ব্যক্তি, যে বিশ্বাস করল মানুষের তৈরি আইনি সংস্থাগুলো ইসলামী শরীয়তের বিধান থেকে উত্তম, অথবা বিশ্বাস করল যে, বিংশ শতাব্দীতে ইসলামী বিধান বাস্তবায়ন করা যুক্তিসঙ্গত নয়, অথবা ইসলাম প্রগতির অন্তরায়, অথবা বলল ইসলাম শুধু ব্যক্তি ও তার রবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, মানুষের জীবনের অন্য কোনো অংশে প্রবেশ করার অধিকার ইসলামের নেই"।

ইসলামি শরিয়ত ছাড়া অন্য কিছুর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত শান্তি ধর্তব্য নয়। কারণ শান্তি ও নিরাপত্তার প্রকৃত অর্থ হলো, শরিয়তপ্রদত্ত অধিকারসমূহের সংরক্ষণ করা। শরিয়তের বাইরে অধিকারের অন্য কোনো ব্যাখ্যার সংরক্ষণ করা মানে জমিনে ফ্যাসাদ ও জুলুম প্রতিষ্ঠা করা। শরয়ি অধিকারসমূহের সংরক্ষণ একমাত্র ইসলামি ইমারাহ-ই করতে পারে। এজন্য শান্তি ও নিরাপত্তা তখনই প্রতিষ্ঠিত হবে, যখন কুফুরি (তাগুতি) ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে ইসলামি শাসন চালু হবে। এ ছাড়া শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

শেষকথা

ইসলামে ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে কিছু নেই। ইসলামের মূল ভিত্তি হল আল্লাহর কালাম কুরআন মজীদ। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وان احكم بينهم بما انزل الله

আর তাদের মাঝে আপনি ফয়সালা করুন ঐ আইন দ্বারা, যা আপনার প্রতি আল্লাহ তাআলা নাযিল করেছেন।-সূরা মায়েদা : ৪৯

এখানে আল্লাহর নাযিলকৃত আয়াতই ইসলামী শরীয়াহ। অন্যত্র আছে-

ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون ...فأولئك هم الكافرون .....فاولئك هم الفاسقون

যারা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করে না তারা জালিম ... তারা কাফির... তারা ফাসিক।-সূরা মায়েদা: ৪৪, ৪৫ ও ৪৭।

এটা কি কখনো সম্ভব বা যুক্তি সঙ্গত যে, একজন মুসলিম ইসলামের সঠিক জ্ঞান ও শরীয়তের বিদ্যার্জন করবে এমন লোকদের থেকে, যারা কট্টর কাফের, ইসলাম ও মুসলিমের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণকারী?!

ইসলামের সকল শাখায় পরিপূর্ণরূপে প্রত্যেক মুসলিমের প্রবেশ করা ফরয। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدۡخُلُواْ فِي ٱلسِّلۡمِ كَآفَّةٗ ٢٠٨ ﴾]البقرة :٢٠٨[

"হে মুমিনগণ, তোমরা ইসলামে পূর্ণরূপে প্রবেশ কর"।(সূরা বাকারা:২০৮)
কুরআনুল কারিমের কতক বিধান গ্রহণ করে কতক বিধান ত্যাগকারীকে আল্লাহ তা'আলা কাফের বলেছেন। ইরশাদ হচ্ছে:

﴿ أَفَتُؤۡمِنُونَ بِبَعۡضِ ٱلۡكِتَٰبِ وَتَكۡفُرُونَ بِبَعۡضٖۚ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفۡعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمۡ إِلَّا خِزۡيٞ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۖ وَيَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰٓ أَشَدِّ ٱلۡعَذَابِۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعۡمَلُونَ ٨٥ ﴾]البقرة :٨٥[

"তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশে ঈমান রাখ আর কিছু অংশ অস্বীকার কর? সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা তা করে দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ছাড়া তাদের কী প্রতিদান হতে পারে?

আর কিয়ামতের দিনে তাদেরকে কঠিনতম আযাবে নিক্ষেপ করা হবে। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে গাফেল নন"।(সূরা বাকারা:৮৫)

সুতরাং, পবিত্র কুরআনই পরিপূর্ণ ইসলামী শরীয়াহ নির্দেশ করে। জীবনের প্রতিটি সমস্যার সমাধান কুরআনে রয়েছে । শুধু ইবাদাত করার জন্য আল্লাহর বিধান মানবে, আর রাষ্ট্র পরিচালনা করতে নিজেদের মনগড়া আর পাশ্চাত্যদের অনুসরণ করবে তা করা যাবে না । আখিরাতে কঠিনতম দিনে আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার ভয় যেন আমাদের ইসলামী শরীয়াহ বা আল্লাহ প্রদত্ত জীবন-বিধান মোতাবেক জীবনযাপনের তৌফিক দেন।

সেক্যুলারিজম এবং ইসলামী শরীয়াহর মৌলিক ধারণাগুলোর মধ্যে রয়েছে গভীর ভিন্নতা। সেক্যুলারিজম একটি ধর্মহীন ধারণা, যা ধর্মকে রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম থেকে আলাদা করার উপর জোর দেয়। নাস্তিকতাই রাষ্ট্রের ভিত্তি হয়ে ওঠে। এমনকি রাষ্ট্রের বিভিন্ন আইনের জন্য ইসলাম শরীয়তবিরোধী কাজ করতেও বাধ্য হতে হয়। অন্যদিকে, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যা আমাদের ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার ধারণা দেয়। ইসলামের শাসন ব্যবস্থায় শরীয়াহ আইন প্রধান, যা রাষ্ট্রের কার্যক্রমের সাথে যুক্ত এবং আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আনুগত্যের দাবি রাখে, এখানে সেক্যুলারিজমের কোনো স্থান নেই। তাই বলা যায়, সেকুলারিজমের ধারণা ও ইসলামের রাষ্ট্র পরিচালনার ধারণা একে অপরের সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

ইসলামী শরীয়াহ ব্যতীত অন্য জীবনব্যবস্থা হোক তা সেক্যুলারিজম বা অন্য কিছু দুনিয়াতে সে মোতাবেক চললে
আল্লাহ সুবহানু ওয়া তা'য়ালা সেটি পরকালে কখনো গ্রহন করবেন না।

আল্লাহ বলেছেন,

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿۸۵

আর যে ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো জীবনব্যবস্থা তালাশ বা অবলম্বন করবে, তার কাছ থেকে সেটি কোনো দিনই গ্রহণ করা হবে না। আর সে ব্যক্তি পরকালে হবে ব্যর্থ ও মহা ক্ষতিগ্রস্ত। —সূরা আলে ইমরান, ০৩ : ৮৫

আলোচনার সমীপে, অকপটেই বলতে পারি, সেক্যুলারিজম নাকি ইসলামী শরীয়াহ, কোনটি উত্তম? প্রশ্নের জবাবে -অবশ্যই ইসলামী শরীয়াহই উত্তম।

ফুটনোট:

★ইসলামী শরীয়াহর বাস্তবায়ন ও উম্মাহরউপর এর প্রভাব-লেখক:আব্দুল্লাহ ইবন স'উদ আল-হুয়াইমিল
অনুবাদ: আব্দুল্লাহ আল মামুন
সম্পাদনা: ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী

★সেক্যুলারিজম-লেখক:অধ্যাপক ফজলুর   রহমান

★সেক্যুলারিজমের ইসলামীকরণ-লেখক:সংকলন:ড.ফাহাদ ইবন সালেহ আল-আজলান
অনুবাদ: আব্দুল্লাহ মজুমদার

★ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও ইসলাম- অনুবাদ:মুহাম্মদ নূরল্লাহ তারীফ
সম্পাদনা:ড.আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

★সংশয়বাদী-অনুবাদ:আসিফ আদনান
লেখক:ড্যানিয়েল হাকিকাতজু

★অবাধ্যতার ইতিহাস। লেখক: ডা. শামসুল আরেফীন শক্তি

★চিন্তাপরাধ-লেখক:আসিফ আদনান

★হিউম্যান বিয়িং(শতাব্দীর বুদ্ধিবৃত্তিক দাসত্ব)-লেখক:ইফতেখার সিফাত

★ ইসলামী জীবন ব্যবস্থা-লেখক: মুফতি তারেকুজ্জামান

★ ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার মূলনীতি-লেখক: শায়খ আবদুল হাকিম হক্কানি
অনুবাদ :আবদুর রশীদ তারাপাশী

★২০২৪ মাসিক আলকাউসার। সম্পাদক ও প্রকাশক: আবুল হাসান মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ।